ম্যাজিক শেখো গল্পে

এ. সি. সরকার

ম্যাজিক শেখো গল্পে

ম্যাজিক শেখো গল্পে

যাদুসম্রাট এ. সি. সরকার

অনন্য প্রকাশন
৬৬ কলেজষ্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

লেখকের কথা

গল্পের মোহ আর ম্যাজিকের মায়া এ দুই-ই সমান ভাবে আকর্ষণ করে ছোটদের মন। এই কারণেই ছোটদের অতি প্রিয় এই দুটি উপাদানকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ছোটদের উপাদেয় একটি মজাদার বস্তু সৃষ্টি করার তাগিদ বারে বারে আসছিল আমার মনের ভেতর থেকে। এই তাগিদ যখন আমাকে আর স্থির থাকতে দিল না তখনই আমি সৃষ্টি করলাম আমার 'ম্যাজিক গল্প।'

এ এমন একটি জিনিস যাতে গল্পের চমক, মজা আর কৌতুক তো আছেই অধিকন্তু তার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছে ম্যাজিকের মজাদার সব রহস্য। গল্প পড়ে মজা পাবার শেষ পর্যায়ে পাঠকদের সামনে খুলে যায় যাদু-রোমাঞ্চের এক একটি রহস্যের গুপ্ত দ্বার।

আজ থেকে প্রায় বারো চৌদ্দ বছর আগে শুরু করেছিলাম এই 'ম্যাজিক গল্প' লেখা। এই 'ম্যাজিক গল্পে' আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন দেশ-বিদেশের নানা শিশুদের পত্রিকা প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাদ্রাজের প্রখ্যাত চাঁদ মামা প্রকাশনা সংস্থা।

ঐ সব 'ম্যাজিক গল্প' থেকে বাছাই করে কয়েকটি নিয়ে বাংলা ভাষায় সাজিয়ে দিলাম এই বইয়ে, বাঙালী ভাই-বোনেদের জন্য।

এ বইয়ে তেমন তেমন ম্যাজিকের কৌশলই কেবল তুলে ধরেছি যা অল্প আয়াসে আয়ত্ব করা যাবে আর স্টেজ ছাড়াও দেখানো সম্ভব হবে। তেমন দরকার হলে শাড়ি, বিছানার চাদর ইত্যাদি জুড়ে তাই দিয়ে পর্দা বানিয়ে নিয়েও কাজ চালানো যাবে ঘরোয়া পরিবেশে।

অভ্যাস আর অনুশীলন হচ্ছে ম্যাজিক মূল কথা। যত বেশী অভ্যাস আর অনুশীলন করা যাবে ততইপটুতা অর্জন করা সম্ভব হবে। প্রদর্শন হবে তত নিখুঁত আর চমৎকার।

চাঁদ মামা পত্রিকায় প্রকাশিত আমার এই গল্পগুলি সংকলিত করার অনুম তি দেওয়াতে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। এই বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করায় প্রকাশক শ্রীহীরক রায় আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

॥ ম্যাজিক ভিলা ॥
১২/৬, সেলিমপুর রোড
কলিকাতা—৭০০০৩১
১৫ই আগস্ট, ১৯৮২

এ. সি. সরকার
(যাদুকর)

যাদুকর এ. সি. সরকার স্টেজে বহুবার ভ্যানিসিং ট্রিক দেখিয়েছেন দর্শকদের সামনে। অথচ সেই মানুষটির সঙ্গে মৃত্যু যখন তার জীবন নিয়ে ভ্যানিসিং ট্রিকের চরম অংকে পৌছল তখন এ. সি. সরকার মাত্র মধ্য পঞ্চাশে। নানা পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেত। জীবনকে নিয়ে, জীবন মরণকে ঘিরে নানা কৌতুহল যে তাঁর মনে দানা বেঁধেছে, বুঝতে পারতাম তাঁর কথাবার্তায়। দর্শন এবং পুরানে প্রচুর পড়াশোনা করা মানুষটি কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে নিজেকে শেষ পর্যন্ত নিমগ্ন রেখেছিলেন তা জানতে পারিনি। তিনি কেমন যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে, শেষের ঘণ্টা বাজছে। সম্ভবত তাই দুরাভাসে একদিন বলেছিলেন, 'সময় হয়ে গেছে। আমি এখন তৈরী, আপনারা কাগজে খবর পাবেন।'

ম্যাজিক ছাড়াও এ. সি. সরকার ছড়ার মিলে এক নতুন রীতির সূচনা করেছিলেন, বিস্তর দেখা, অনেক পড়া, বহুজনের সঙ্গে মেশার নিরিখে আরো অনেক কিছু করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। দুর্ভাগ্য, মৃত্যু সে সময়টুকু তাঁকে দেয়নি। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।
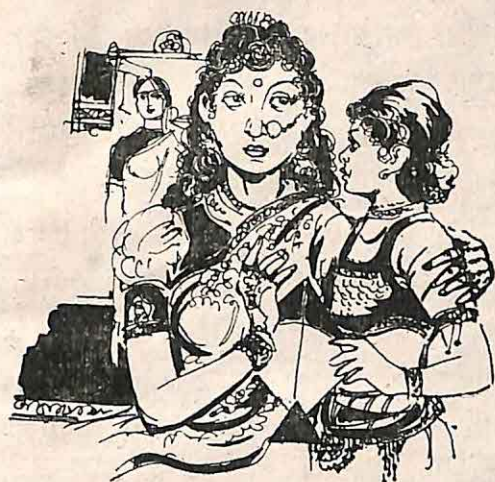
মড়ার সঙ্গে বিয়ে

নন্দিনী নদীর দুই পারে দুই রাজ্য—রুদ্রপুর আর দেবগিরী। নদীর দুই পারে দুই রাজ্য হলে কী হবে। রুদ্রপুর থেকে দেবগিরী ভাঁটা পথে এক দিন এক রাত্রির পথ। উজান পথে দাঁড় টেনে এলে রুদ্রপুর থেকে দেবগিরীতে যেতে লাগে পাক্কা দু দিন দু রাত্রি। রুদ্রপুরের রাজা প্রতাপের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল দেবগিরীর রাজা দেবপালের। কন্যার নাম রূপমতি। দেবপালের গুণের শেষ নেই। প্রজাদের সে নয়নের মণি। সুন্দরী রূপমতিকে নিয়ে সুখে কাটে তার দিন। দু বছর গেল, তিন বছর গেল। দেখতে দেখতে কেটে গেল ছটি বছর তবুও কোন ছেলেমেয়ে হল না রাজা দেবপালের। বংশধর তো চাই একজন! অপেক্ষা করেও যখন কোন ছেলেমেয়ে হল না তখন সবার পরামর্শে দেবপাল আবার বিয়ে করলেন। এবার যাকে বিয়ে করলেন সেই নতুন রানীর নাম কালিন্দী। দেখতে সুন্দরী হলে কী হবে, কালিন্দীর স্বভাব কিন্তু রূপমতির মত এত ভাল ছিল না। তার স্বভাব ছিল কুটিল আর

হিংসুটে। রূপমতিকে সে সহ্য করতে পারতো না মোটেই। দুই রানী বাস করে দুই মহলে।

এর পরে কেটে গেল আরো চার পাঁচ বছর। কোন রানীরই কোন ছেলেমেয়ে হল না। শান্তি নেই রাজার মনে। প্রজা, পাত্র-মিত্র, সভাসদ কারো মনে শান্তি নেই। এত বড় রাজ্য। কে বসবে সিংহাসনে? রাজকার্যে মন বসে না রাজার। ভুলে থাকার জন্য রাজা সব সময় মেতে থাকেন মৃগয়াতে।

একবার রাজা মৃগয়াতে গেলেন এক গভীর বনে। বনের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে চলতে দল-বল থেকে আলগা হয়ে গেলেন রাজা। গভীর বনে পথ হারিয়ে ফেললেন তিনি। সন্ধ্যা নেমে এলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই নেমে আসবে কালো আঁধার রাত্রি। একটা বড় গাছের তলায় ঘোড়া বেঁধে রেখে রাজা গিয়ে উঠলেন গাছের মগডালে। নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে রাজা এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন গাছের অদূরের এক গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে এক বিরাট অজগর। সাপটা বিপুল গর্জনে এগিয়ে এলো সেই গাছের তলায়। বিরাট হাঁ করে অজগরটা আস্তে আস্তে গিলতে থাকলো রাজার প্রিয় ঘোড়াটাকে। ততক্ষণে রাত্রির ঘন ছায়া নেমে এসেছে সারাবনে। গাছের উপর থেকে অসহায় রাজা শুধু শুনতে পেলেন তাঁর প্রিয় ঘোড়ার করুণ আর্তনাদ আর হুটোপুটির শব্দ। তারপর সব নিস্তব্ধ। নিশাচর পশুপাখির ডাক ছাড়া আর কিছু কানে এলো না সারারাত। একটা তেডালার মাঝখানে জুৎ করে বসে আধা ঘুমে আধা জাগরণে রাত কাটালেন রাজা।

ধীরে ধীরে রাত শেষ হল। এলো প্রভাত। গাছের তলায় চোখ পড়তে এত সাহসী যে রাজা তারও শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। গাছের গোড়াটাকে জড়িয়ে ধরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে অজগরটা। তার ক্রুর চোখের দৃষ্টি লেহন করছে

রাজার সর্বশরীর। হঠাৎ এক অমিত সাহস সঞ্চারিত হল রাজার মনে। ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে রাজা ধনুকে জুড়লেন এক মহা মারণ-বাণ। ধনুকের ছিলা টান টান করে রাজা দেবপাল ছুড়লেন বাণ। তীরবেগে ছুটে গিয়ে বাণ লাগলো অজগরের ডান চোখে। থেতলে গেল অজগরের বিরাট মাথা তীরের আঘাতে। মৃত্যু যন্ত্রণায় বনভূমি তোলপাড় করে বিশাল অজগর তার লেজ আর শরীর আছড়াতে লাগলো। বিষতীরের প্রভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই স্থির নিশ্চল হয়ে পড়লো ভয়াল অজগর।

গাছ থেকে নামবেন কিনা ভাবছেন রাজা দেবপাল, এমন সময় ঘটল এক আজবকাণ্ড। দানব অজগরের কুৎসিত শরীরটা হঠাৎ ছেয়ে গেল এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে। অজগর রূপ বদলে হয়ে গেল এক জীবন্ত দেবদূত।

শান্ত হাসিতে মুখ ভরিয়ে দেবপালের দিকে তাকিয়ে দেবদূত বললো—"ভয় নেই রাজা, তোমার কল্যাণে আজ আমি মুক্ত হলাম দেবতার অভিশাপে এত দিন আমি যাপন করছিলাম অজগরের ঘৃণ্যজীবন। এবার আমি তোমার তীরের আঘাতে অভিশাপ থেকে মুক্ত হলাম। এবার আমি ফিরে যাব স্বর্গপুরীতে। যাবার আগে তোমাকে আমি একটি বর দিয়ে যেতে চাই। নেমে এসো, বল কী বর তোমার চাই।"

দেবপাল গাছ থেকে নেমে এসে দেবদূতকে প্রণাম করে জোর হাতে বললেন—"প্রভু, আমার কোন সন্তান নেই। যদি আমাকে একটি পুত্র সন্তান লাভের বর দেন তবে খুব ভাল হয়।"

দেবদূত রাজার হাতে একটা সরু সোনার হার দিয়ে বললেন—"তোমার বড় রানীকে এই হার পরতে দেবে। এই হার পরলেই তার পেটে ছেলে আসবে। লক্ষণ প্রকাশ পেলেই সে যেন এই হার গলা থেকে খুলে সাবধানে সারাক্ষণ রাখে তার আঁচলে বেঁধে। এর পরে যা করতে হবে তা আমি নিজেই তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে

বলে দেব। তোমার কোন ভয়-ভাবনা নেই। এই ব্যাপারটা খুব গোপনে রাখবে। আর কেউ যেন জানতে না পারে, তবে কিন্তু ক্ষতি হবে।" কথা শেষ করে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় দেবদূত। আর তার জায়গায় দেবপাল দেখতে পান তাঁর প্রিয় ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে জিন-লাগাম লাগিয়ে সাজানো অবস্থায়।

বাড়ি ফিরে দেবপাল দেবদূতের কথা মতন সব কাজ করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রূপমতির শরীরে সন্তানের মা হবার সব লক্ষণ প্রকাশ পেলো। রূপমতি হার খুলে আঁচলে বাঁধলেন। তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে দেবদূত বললেন, "মা, হারটাকে একটা ছোট সোনার কৌটোয় ভরে, কাউকে না জানিয়ে একাকী চলে যাবে তোমার নিজের বাগানে। রাত দুপুরে সবার অজান্তে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেবে এই হারের কৌটো। কেউ যেন জানতে না পারে এই হারের কথা। মনে রেখো এই-ই হচ্ছে তোমার ছেলের জীবনের বীজ।"

দেবদূতের কথা মতন রূপমতি দুপুর রাতে তাঁর নির্জন বাগানে পুঁতে দিলেন হারের কৌটো। দেখতে দেখতে তাঁর চোখের সামনে মাটি থেকে গজিয়ে উঠলো এক গোলাপের চারা। দেবদূতের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে রূপমতি ফিরে এলেন তাঁর মহলে, কেউ কিছু জানবার আগেই।

এর পর দিন কাটে মাস কাটে। ধীরে ধীরে রূপমতির শরীরের সব অঙ্গে ফুটে ওঠে মা হবার সব লক্ষণ। পরিবার-পরিজন, দাস-দাসী সবাই জানতে পারে, বড় রানীমা মা হতে যাচ্ছেন। রাজা পাত্র-মিত্র, সভাসদ-প্রজাগণ সবাইকে দেন সু-সংবাদ। সবার মন ভরে ওঠে আনন্দে।

কালিন্দীর প্রাণে কিন্তু জ্বলে হিংসার আগুন। তাঁর মনে শান্তি নাই। কেন তাঁর পেটে এলো না সন্তান। এলো রূপমতির পেটে। অশান্তিতে জ্বলে পুড়ে মরেন তিনি রাত্রি-দিন।

দশ মাস কেটে যায়। পার হয়ে যায় দশ মাস দশ দিন। তবুও জন্মায় না সন্তান। একি বিপদের কথা! রাজা ডেকে পাঠান রাজ্যের যত সেরা সেরা ধাত্রী-বিদ্যা বিশারদকে। কেউ কোন সমাধান খুঁজে পায় না সঙ্কটের। এগার মাসও পার হতে চলে। ব্যাপার কী?

আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে এক দিন দুপুর রাতে রূপমতি একাকিনী চলে আসেন তার বাগানে সবার অজান্তে। আপন মনে অঝোর ধারায় কেঁদে বুক ভাসান তিনি গোলাপ গাছের সামনে বসে। ভক্তি ভরে ডাকেন দেবদূতকে; দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে গোলাপ গাছে ধরে এক অপরূপ কলি। কলি বেড়ে বেড়ে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। কি অপূর্ব সে গোলাপের শোভা! কি অবর্ণনীয় তার সুবাস! ফুল ফিস-ফিসিয়ে বলে "মা, আমাকে তুলে নিয়ে গিলে খেয়ে ফেল। কিছুক্ষণ পরেই আমি তোমার শরীর থেকে তোমার ছেলের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসবো। আমাকে গিলে খেয়ে, নিজের মহলে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকো গে দোরে খিল এঁটে।"

সেই মত কাজ করলেন রূপমতি। দোরে খিল এঁটে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সব আলস্য এসে ভর করলো তাঁর সারা দেহে। অসাড়, আড়ষ্ট শরীরে অজ্ঞানের মত ঘোরে পড়ে থাকলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে আপনা থেকেই শরীরে বল ফিরে পেলেন তিনি। কেটে গেল সব ঘোর, সব আচ্ছন্নতা। তাকিয়ে দেখলেন তাঁর পাশে শুয়ে আছে এক নবজাত, ফুট-ফুটে ছেলে। ছেলের দিকে তাকাতেই ছেলে এক বার এক ঝলক মিষ্টি হাসি হেসে ওয়াও—ওয়াও করে তারস্বরে কান্না জুড়ে দিলো। প্রাসাদ-শুদ্ধ সবাই জানতে পারলো রানী রূপমতির সন্তান হয়েছে। দোর খুলতে সবাই এসে ঢুকলো ঘরে। অপরূপ রাজকুমারকে দেখে তো সবাই আহ্লাদে আত্মহারা।

দিন যায় রাত যায়। চন্দ্রকলার মত বাড়ে রাজপুত্র। তাকে নানা শাস্ত্রে শিক্ষা দেন রাজ্যের যত সেরা সেরা পণ্ডিত আর নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। সত্যিই তুলনা নেই রাজকুমারের। তার ব্যবহারে মুগ্ধ সবাই। তার শৌর্য, বীর্য, বিনয় আর সুশীলতার কথা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পুত্র-গৌরবে গর্ব বোধ করেন রাজা দেবপাল আর রানী রূপমতি। কালিন্দী জ্বলে পুড়ে মরেন হিংসায়। তাঁর হিংসার আগুনে ইন্ধন জোগায় তার খাস দাসী মন্থরা। তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে হয় নি, তাই তাঁর মনে এত জ্বালা।

রাজপুত্রের নাম গোলাপকুমার। রূপমতি নিজেই রেখেছেন তাঁর ছেলের নাম। রাজা অমত করেন নি। গোলাপকুমারকে দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন ছোটরানী কালিন্দী। তাঁর ঝি মন্থরারও সেই একই মনের অবস্থা। কেমন করে গোলাপকুমারের ক্ষতি করা যায় সেই মতলব আটেন কালিন্দী। তাঁকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত তাঁর দাসী মন্থরা।

নানা রঙের আর নানা ঢং-এর ঘুড়ি ওড়ানো গোলাপকুমারের অতি প্রিয় কাজ। সময় পেলেই সে মেতে ওঠে ঘুড়ি ওড়ানোর খেয়াল-খেলায়। ময়না, চাঁদিয়াল, চাপরাস, মুখপোড়া···কত রং-বাহারী ঘুড়ি বানায় গোলাপকুমার। ওড়ায় প্রাসাদের ছাত থেকে। ঘুড়ির কসরৎ দেখে খুশি হয় সবাই।

একদিন দুপুর বেলা গোলাপকুমার উড়াচ্ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় ঘুড়ি চন্দ্ররাজকে। কি তার রঙ! কি তার বাহার! নানা কসরৎ দেখাচ্ছিল তার ঘুড়ি চন্দ্ররাজ। সাঁ করে উঠছিল উপরে আবার বোঁ করে গোত্তা খাচ্ছিল নিচের দিকে—আবার বাঁক ঘুরে কোনাকুনি উপরে উঠে বোঁ বোঁ করে পাক খাচ্ছিল নীল আকাশের আঙ্গিনায়।

হঠাৎ যে কী হল চন্দ্ররাজের। স্যাৎ করে গোঁৎ খেয়ে চন্দ্ররাজ হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লো ছোটরানীর মহলের ছাতের উপরে। ভর

দুপুর। সবাই খেয়েদেয়ে দিবানিদ্রার আমেজে মসগুল। গোলাপ কুমার পা টিপে টিপে গিয়ে ঢুকলো তার ছোটমার মহলে। ছোট-মার মহলে বড় একটা যেতো না গোলাপকুমার। মায়ের বারণ ছিল।

গোলাপকুমারকে দেখেই তাড়াতাড়ি ছুটে এলো ছোটমায়ের দাসী মন্থরা।

"আসুন, আসুন, রাজকুমার! কি সৌভাগ্য আমাদের। আপনার শ্রীচরণের ধুলো পড়লো আমাদের মহলে!"

সাদরে গোলাপের গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মন্থরা ডাকলো রানী কালিন্দীকে—"মা, মা, এসো, দেখো তোমার আদরের নিধি এসেছেন।"

ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে কালিন্দী বুকে জড়িয়ে ধরলেন গোলাপকুমারকে।—"এসো বাবা, মানিক আমার। আজ কোন্ দিক থেকে সূয্যি উঠেছে। সোনার চাঁদ এসে হাজির হয়েছে অভাগিনী ছোটমায়ের মহলে। বল বাবা, হঠাৎ এই অভাগিনীর উপর এ দয়া কেন?"

কালিন্দীর অনুযোগে সঙ্কোচ বোধ করে গোলাপ। ধীর শান্ত মিষ্টিগলায় সে বলে—"ছোটমা, আমার চন্দ্ররাজ ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে পড়েছে আপনার মহলের ছাতে। তাই নিতে এসেছি।"

"তাতে কী হয়েছে? এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।" কথা বলে মন্থরা গোলাপের অলক্ষ্যে কালিন্দীর দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। তার পর এক ছুটে ছাতে গিয়ে নিয়ে আসে চন্দ্ররাজ ঘুড়িটা। ঘুড়িটা নেবার জন্য গোলাপকুমার হাত বাড়াতে কালিন্দী সোহাগ মাখা মিষ্টি গলায় বলে—"না বাবা, এখুনি নয়। আমি তোমাকে ঘুড়িটা দেবার আগে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তোমার মায়ের কাছ থেকে একটি ব্যাপার জেনে এসে আমাকে জানাতে হবে। সঠিক ব্যাপারটা আমাকে যেইমাত্র জানাবে সেই মাত্র এ

ঘুড়ি তোমাকে দোব আমি।"

"কী ব্যাপার, ছোটমা?"

"এমন কিছু নয়। তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি জেনে এসে আমাকে বল, তোমার জীবনের মূল বীজ কী। আমি যে জানতে চেয়েছি তা কিন্তু বোলো না তোমার মাকে। কায়দা করে জেনে এসো এক্ষুণি। কায়দা মতন বায়না ধরলে তোমার মা তোমাকে না বলে পারবেন না আসল রহস্যের কথা। দেখি তুমি কেমন বাহাদুর ছেলে! এই কাজটা করে আসতে পার কি না।"—কথার শেষে এক রহস্যময় হাসি ফোটে ছোটরানী কালিন্দী আর দাসী মন্থরার চোখে মুখে।

গোলাপকুমার ফিরে এলো রূপমতির মহলে। এসে দেখলো ঘুমিয়ে আছে তার মা। মায়ের পাশে শুয়ে আদুরে গলায় সে ডাকলো তার মাকে। মার ঘুম ভাঙতে গোলাপ বলে তার মাকে, "মা তুমি মোটেই ভালোবাসো না আমাকে।"

"এ কি কথা বাছা? এমন কথা বলছিস কেন? কী হল তোর?"

"যদি সত্যিই ভালবাসো আমায় তবে একটি কথা কিন্তু বলতেই হবে আমাকে।"

"কী কথা, বাবা?"

"আমার জীবনের মূলবীজ কোথায় মা? খুলে বল না আমাকে!"

কথা শুনে আৎকে ওঠেন রূপমতি। এমন প্রশ্ন করছে কেন আজ ছেলে? প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য রূপমতি বলেন—"সে জেনে দরকার নেই। ও আমার খুবই গোপন কথা। তা শুনতে চাসনে বাবা। দোহাই তোর। অন্য যা জানতে চাইবি তাই বলবো। শুধু ঐ কথাটা জানতে চাসনি, বাপ আমার।"

"আর কোন কথা না বলতে না চাও, না বোলো। আমার

জীবনের মূল রহস্য কী তা বলতেই হবে তোমায়। না বললে ছাড়বো না তোমাকে। আমি খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ করবো কিন্তু তা হলে। তোমাকে বলে রাখছি, মা।" কথা শেষ করে অভিমানে মুখ ফুলিয়ে থাকে গোলাপকুমার।

গোলাপকুমারকে নিরস্ত করার জন্য কত না তর্ক বিতর্ক করেন রূপমতি। গোলাপ নাছোড়বান্দা। কোনও যুক্তিরই ধার ধারে না সে। অবশেষে বাধ্য হয়ে রূপমতি খুলে বলেন সব কথা। গোলাপ গাছের গোড়ায় লুকানো সোনার কৌটোর ভেতরে রাখা সোনার হারের খবর জেনে নিয়ে তবে শান্ত হয় গোলাপকুমার। মায়ের হাতে সোনার গেলাসে ঘন দুধ খেয়ে খেলতে বেরয় গোলাপকুমার।

অল্পক্ষণ পরে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে গোলাপকুমার আবার হাজির হয় ছোটরানী কালিন্দীর মহলে। কালিন্দী আর মন্থরা গভীর আগ্রহে গোলাপের পথ চেয়ে বসেছিলেন। গোলাপের আসতে দেরি হওয়াতে তাঁরা অস্থির হয়ে উঠছিলেন। এবার সে এসে ঢুকতে তাঁরা আশায় বুক বাঁধলেন। তার জীবনের মূল রহস্য সোনার কৌটোয় রাখা সোনার হারের কথা খোলাখুলি বললো গোলাপকুমার ছোটমায়ের কাছে।

"দেখো ছোটমা, রহস্যের কথা কেউ যেন না জানতে পারে। এতে কিন্তু আমার প্রাণ যেতে পারে।"

"তুমি ভেবো না বাছা, এ কথা দুকান হবে না। ছেলের যাতে অকল্যাণ হয়, কোন মা কি তা করতে পারে?" হাসতে হাসতে বলেন ছোটরানী কালিন্দী।

সেই রাত্তিরেই কালিন্দী মন্থরাকে পাঠালেন বড়রানীর খাশ বাগানে। অন্ধকারে চুপি চুপি গিয়ে মন্থরা সবার অজান্তে গোলাপ গাছের মূলের তলা থেকে তুলে নিয়ে এলো হারের কৌটো। হার নিয়ে কালিন্দী পরলেন তাঁর গলায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই উপড়ে ফেলা গোলাপ গাছটা পাল্টে গেল এক বিষাক্ত সাপে। এই সাপ চলতে চলতে গিয়ে ঢুকলো রূপমতির খাশ কামরায়। রূপমতি তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছেন গোলাপকে নিয়ে। সাপটা গোলাপকুমারের দুই পা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফণা তুলে তীব্রস্বরে হিস্ হিস্ করতে থাকলো। এই তীব্র শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল গোলাপকুমার আর রূপমতির। মাথার কাছ থেকে তার তলোয়ার নিয়ে গোলাপকুমার যেই মাত্র সাপটার ফণায় কোপ বসাতে যাবে তক্ষুণি সাপটা ছোবল মারলো গোলাপকুমারকে। মরণ-ছোবল। কোপ মারা আর হল না। ঢলে পড়লো গোলাপকুমার মরণের কোলে। হাতের তলোয়ার হাতেই থেকে গেল। বিহ্বল রূপমতির চোখের সামনে সাপটা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

ত্রাসে চিৎকার করে উঠলেন রূপমতি। ছুটে এলেন রাজা। ছুটে এলো রক্ষী-সান্ত্রী-প্রহরী। রাজা পরীক্ষা করে দেখলেন গোলাপকুমারের নাড়ী। এক বুক-ভাঙা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে—

"গোলাপ, বাপ আমার, এ কি হোলো তোর!"

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর ওষুধপত্র নিয়ে ছুটে এলেন রাজবৈদ্য। তিনি গোলাপকুমারকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় বাকহারা হয়ে গিয়েছিলেন রূপমতি। ঘোর কেটে যেতে করুণ স্বরে বিলাপ করতে থাকলেন তিনি। কত ওঝা এলো, এলো কত বিষ-বৈদ্যি। গোলাপকুমারকে আর বাঁচানো গেলো না। রাজপ্রাসাদ জুড়ে, রাজ্য জুড়ে, নেমে এলো শোকের ছায়া।

বাকি রাত ধরে চললো চিকিৎসা—ঝাঁড় ফুঁক, তুক-তাক আরো কত কি! পরের দিনও বেলা দুপুর পর্যন্ত করা হল কত কিছু। কোন ফল হল না।

সাপে কামড়ানো মড়া পোড়ানো যাবে না। ভাসিয়ে দিতে হবে নদীর জলে। বানানো হল কলাগাছের এক সুন্দর বড় আকারের ভেলা। নন্দিনী নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো ঐ ভেলাতে এবার চাপানো হবে গোলাপকুমারকে। শোকে বিহ্বল রূপমতি গোলাপের দেহ কোলে নিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদছেন। তিনি ছাড়বেন না গোলাপকে। রাজা, মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র, সভাসদ সবাই এসে বোঝালেন রানীমাকে, অবশেষে রাজি হলেন তিনি গোলাপকে ছেড়ে দিতে। শেষ চুম্বন দেবার জন্য তিনি গাঢ় ভাবে গোলাপের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকালেন। তিনি আর উঠলেন না। তাঁর অসাড় দেহ লুটিয়ে পড়লো গোলাপের দেহের উপড়ে। রাজবৈদ্য নাড়ি দেখলেন। সব শেষ। গোলাপের দেহের সাপের বিষ রানীমার শরীরে প্রবেশ করে তাঁরও মৃত্যু ঘটিয়েছে।

অনেক চেষ্টা-চিকিৎসা করা হল, অনেকক্ষণ ধরে। রানীর দেহেও প্রাণ ফেরানো গেল না। প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ—দুটোই সর্প-বিষে মৃত্যু। পণ্ডিতদের বিধান মত রানী আর রাজকুমার দুজনকেই নদীতে ভাসানো হোল একই ভেলায় চাপিয়ে। ভেলা তর তর করে ভেসে চললো ভাঁটির টানে আপন গতিতে।

এত যে কাণ্ডকারখানা ঘটে গেল তাতে কিন্তু কালিন্দীর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। বার কতক বড়রানীর মহলে এসে সে শুধু করে গেলো শোক দেখানোর অভিনয়। বর্ষণ করলো জোর করে আনা লোক দেখানো অশ্রু-ধারা। স্ত্রী-পুত্রের শোকে রাজা দেবপাল হয়ে পড়লেন বেদনা-বিহ্বল। মন্ত্রী-সেনাপতি, পাত্র-মিত্র, সভাসদ নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন তাঁকে। দেবপালের মনের ব্যথা তবুও ঘুচলো না।

রূপমতির বাবা রাজা প্রতাপ গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। তাঁর সিংহাসনে বসেছেন তাঁর ছেলে, রূপমতির একমাত্র

ভাই চন্দনদেব। তিনি খুব বীর আর বিচক্ষণ রাজা। তাঁর সুশাসনে প্রজারা আছে মহাসুখে। তাঁর একটি মাত্র ছেলে।

রাজা প্রতাপ মারা যাবার এক মাস আগে তাঁর বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁর এক মাত্র সন্তান—এক বছরের মেয়ে সাবিত্রীকে রেখে মারা যান। মন্ত্রীর স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকায় রাজা প্রতাপ মন্ত্রী-কন্যা সাবিত্রীকে প্রাসাদে নিয়ে এসে তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে মন্ত্রী-কন্যা সাবিত্রী রাজ প্রাসাদে লালিতা হচ্ছে রাজ-পরিবারের এক জন হয়ে। চন্দনদেব তাকে দেখেন ঠিক তাঁর নিজেরই মেয়ের মত। এক রাজকুমারীরই মত নানা বিদ্যায় আর শস্ত্রে-শাস্ত্রে শিক্ষিতা হয়ে উঠছিল সে নানা ওস্তাদ আর পণ্ডিত-শিক্ষকদের কাছে। চন্দনদেবের যত্ন-চেষ্টায় সে হয়ে উঠেছিল এক মহাগুণবতী আর রূপবতী কুমারী।

ভেসে চলছে ভেলা স্রোতের টানে ভাঁটার দিকে। নদীর মুক্ত বিশুদ্ধ হাওয়া আর শীতল স্রোতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে রূপমতির দেহে আসতে থাকে সজিবতার স্পন্দন। আসলে তাঁর মৃত্যু হয় নি। গোলাপকুমারের ঠোঁটের পরশে তাঁর শরীরে শুধু সাময়িক বিষ-ক্রিয়া হয়েছিল। আকাশে ফুটেছিল পূর্ণিমার চাঁদের ফুটফুটে আলো। তাঁর কানে আসছিল কুলু-কুলু কুলু-কুলু নদীর কলতান। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা মুখে লাগতেই এক ঝটকায় ভেঙ্গে গেল রূপমতির আচ্ছন্ন ভাব। সব কথা মনে পড়লো তাঁর। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। ধীরে ধীরে বসে পড়ে তিনি তাকালেন গোলাপ-কুমারের দিকে। নিষ্পন্দ পড়ে আছে সে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে না। তিনি নিজের নাক নিয়ে ঠেকালেন গোলাপের নাকে-মুখে। কই, কোন পচা দুর্গন্ধ তো আসছে না। টিপে দেখলেন গোলাপ-কুমারের সারাদেহ। পচনের কোন চিহ্ন নেই দেহে। মড়ার মত শীতল বা কঠিনও হয় নি গোলাপের শরীর। হাত-পায়ের জোড়-

গুলোতেও খিল ধরে যায় নি। স্বাভাবিক জ্যান্ত মানুষের মতই শিথিল ও নমনীয় রয়েছে সেগুলো। শোক-বিহ্বল রূপমতির চোখে লাগে এক আশার আলো – গোলাপের দেহে প্রাণ নেই বটে, তবুও তার দেহ মরে নি এখনো। গোলাপকুমারের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ভেলার উপরে চুপচাপ বসে থাকেন রূপমতি। আপন গতিতে ভেসে চলে ভেলা। শ্রান্তি-ক্লান্তি আর দুর্বলতার চাপে জ্ঞান হারিয়ে রূপমতি আবার এলিয়ে পড়েন ভেলার উপর গোলাপের পাশে।

রুদ্রপুর রাজ্যের সদরঘাটে কাপড় কাচছিল এক ধোপানী। ভোরের আলো ফুটতে তার নজরে পড়লো, ঘাটের পাশে ঝোপের ধারে আটকে আছে ফুলপাতায় সাজানো এক বাহারী ভেলা। ভেলার ভেতরে শুয়ে আছে এক পুরুষ আর এক নারী মূর্তি। ধোপানীর হাঁকডাকে আশ-পাশের অনেক লোক ছুটে এলো। তারা টেনে ডাঙ্গায় তুললো ভেলা। ভাল করে দেখেই ধোপানী চিনতে পারলো তাদের রাজ্যের রাজকুমারী রূপমতিকে বহু দিন থেকেই সে রাজবাড়ীতে কাপড় ধোয়ার কাজ করছে।

খবর গেল রাজা চন্দনদেবের কাছে। মন্ত্রী, সেনাপতি আর রাজবৈদ্যকে নিয়ে তিনি চতুর্দোলায় চেপে এসে হাজির হলেন সদর-ঘাটে। রাজবৈদ্যের ওষুধে জ্ঞান ফিরে পেয়ে রূপমতি উঠে বসলেন। চন্দনদেবকে দেখে গুমরে কেঁদে উঠলেন রূপমতি। রাজবৈদ্য গোলাপকুমারকে পরীক্ষা করে অবাক হলেন। দেহে রক্ত প্রবাহ বইছে। জীবন্ত দেহ কিন্তু প্রাণ নেই। রূপমতি আর গোলাপ-কুমারকে চতুর্দোলায় চাপিয়ে চন্দনদেব ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদে।

রূপমতির ইচ্ছা মতন চন্দনদেব প্রাসাদের এক সুন্দর মহলে শুইয়ে রাখলেন ভাগ্নে গোলাপকুমারকে। রূপমতিও থাকলেন ছেলের সঙ্গে। পালঙ্কের ওপরে রাজশয্যায় শোয়া গোলাপকুমারকে

দেখলে মনে হত যেন সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তার দেহে যে প্রাণ নেই তা বোঝার কোন উপায়ই ছিল না।

প্রাসাদের সবাই রূপমতিকে পেয়ে খুশি। সাবিত্রীর খুশি যেন বাঁধ মানে না। রূপমতির মিষ্টি-সুন্দর ব্যবহার তাকে যেন বশ করে ফেলেছে। সে সব সময় লেগে থাকে রূপমতির সঙ্গে সঙ্গে। রূপমতির মহলেরই একটা ঘরে বাস করে সে এখন। চন্দনদেবও খুশি তাতে। ভাগ্য বিড়ম্বিতা বোন। তাকে নিয়ত সঙ্গ দিয়ে যদি তাঁর মনটা খুশি রাখতে পারে সাবিত্রী তবে তো খুব ভালই হয়।

এক দিন রাতে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো সাবিত্রী। রাত তখন গভীর। চন্দনদেব এসেছিলেন বোনের মহলে কি এক জরুরী পরামর্শ করতে। রূপমতির সঙ্গে চন্দনদেব কথা বলছিলেন গোলাপের ঘরে বসে। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে, মালা হাতে সাবিত্রী ধীর পায়ে এসে ঢোকে সেই ঘরে। কথা নেই বার্তা নেই আপন মনে এগিয়ে গিয়ে সে মালা পরিয়ে দেয় গোলাপের গলায়। তারপর তার হাতে লাগানো গোলা সিঁদুর গোলাপের আঙ্গুলে মাখায়। গোলাপের সেই সিঁদুর-মাখা আঙ্গুলের কাছে মাথা এগিয়ে নিয়ে নিজের সিঁথিতে সেই আঙ্গুল ঠেকিয়ে গোলাপের হাত দিয়ে নিজের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে নেয়।

বিরক্ত হয়ে চন্দনদেব এগিয়ে এসে বলেন—"পাগলের মত এমন কী করছো তুমি, সাবিত্রী ?"

নির্ভীক, অকপট, শান্ত গলায় সাবিত্রী উত্তর দেয়—"মহারাজ, স্বপ্নাদেশ পালন করছি। স্বপ্নে দেখা দিয়ে এই মাত্র এক জ্যোতির্ময় দেবদূত আমাকে এ সব করার জন্য আদেশ করলেন। তাঁর আদেশ অমান্য করলে আমাদের কারও ভাল হত না, মহারাজ।"

"এই যে যেসব কাজ তুমি করলে, তার ফলে কাণ্ডটা কী হল তুমি জানো, সাবিত্রী ?"

"জানি মহারাজ, আজ থেকে গোলাপকুমার আমার স্বামী হলেন। আমি হলাম তাঁর ধর্মপত্নী।"

"তার মানে, তুমি আপন ইচ্ছায় আমার মরা ছেলেকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিলে?" প্রশ্ন করলেন রূপমতি।

"না মা, আপন ইচ্ছায় নয়। এক জ্যোতির্ময় দেবদূতের ইচ্ছায়। তাঁর কৃপায় আমি আপনার মৃত পুত্রের দেহে জীবন ফিরিয়ে আনার ব্রত গ্রহণ করেছি। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন।" গলায় আঁচল জড়িয়ে সাবিত্রী প্রণাম করে রূপমতি আর চন্দনদেবকে।

এর দিন তিনেক পরে এক সন্ধ্যায় রূপমতি গোলাপের ঘরে বসে সাবিত্রীর সঙ্গে কথা কইছিলেন এমন সময় এক অবাক কাণ্ড ঘটলো। চিৎ করে শুইয়ে রাখা গোলাপকুমারের শরীর হঠাৎ ওদের দিকে পাশ ফিরে শুলো আপনা থেকেই। রূপমতি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন বিছানার পাশে। ডাকলেন—'গোলাপ, বাবা গোলাপ।"

গোলাপ চোখ মেলে উঠে বসলো। মা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। আদর করলেন। গোলাপ কথা প্রসঙ্গে মাকে জানালো সেই সে দিনের ঘুড়ি হারানোর আর হারের রহস্যের কথা।

"তাই বল বাপ আমার। তবে ঐ হতচ্ছারী কালিন্দী ডাইনীই আমার এই সর্বনাশ করেছে। নিশ্চয়ই গোলাপতলা থেকে ও সোনার হার তুলে নিয়েছে। বাবা, তোর চেতন-অচেতন, মরণ-বাঁচন এখন ঐ কালিন্দী ডাইনীর হাতের মুঠোয়। কী করে যে তোকে বাঁচাই, বাবা! ও হার আমার দখলে যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ তোর প্রাণও আসছে না তোর দেহের দখলে। কী যে করি!" কথা শেষ করে রূপমতি তাকালেন ছেলের দিকে। তাকিয়েই অবাক হলেন তিনি। গোলাপকুমার আবার লুটিয়ে পড়েছে বিছানার উপরে অসাড়, প্রাণহীন দেহে। কী করে যে কী হল

বুঝতে পারলেন না রূপমতি। সাবিত্রী, লক্ষ্য করেছিল গোলাপের এই হঠাৎ বেঁচে ওঠার আজব-কাণ্ড।

আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল কি, সে দিন সন্ধ্যায়, ভুলক্রমে কালিন্দী ঐ হারটা তাঁর গলা থেকে খুলে রেখে গা ধুতে গিয়েছিলেন, যতক্ষণ ঐ হার খুলে রাখাছিল ততক্ষণই গোলাপকুমারের দেহে প্রাণের সাড়া জেগেছিল। যেইনা গা ধোয়া সেরে এসে কালিন্দী আবার গলায় হার পরলেন অমনি গোলাপকুমার আবার নির্জীব অসাড় হয়ে পড়লো।

বেশ অনেক দিন হয়ে গেছে গোলাপকুমার আর রূপমতি মারা গেছে। এই কথা খেয়াল হতে এখন কালিন্দী প্রায়ই গলা থেকে হার খুলে রাখতেন। আর গোলাপও প্রায়ই বেঁচে উঠতো। খুশি হতেন রুদ্রপুর রাজপ্রাসাদের সবাই। এমনি এক জীবন্ত লগ্নে অনুষ্ঠান করে গোলাপকুমারের হাতে চন্দনদেব সমর্পণ করেছিলেন সাবিত্রীকে। এমনি ধারা জীবন-মৃত্যুর আলোছায়ায় কাটছিল গোলাপকুমার আর সাবিত্রীর বিবাহিত জীবন। এখন প্রায় দিনই রাত্রে হার খুলে নির্ভয়ে ঘুমোতেন রানী কালিন্দী আর তার ফলে প্রায় দিন রাত্রেই গোলাপকুমার থাকতো জীবন্ত।

কিন্তু এভাবে তো আর জীবন চলে না। সাবিত্রী ভাবে আর ভাবে। পরিকল্পনা করে কোন ভাবে হারটা দখল করে নিয়ে আসা যায় রানী রূপমতির কাছে। তাদের মনে ভয়, কোন খেয়ালের বশে কালিন্দী যদি ঐ হার আগুনে ফেলেন। তবেই তো সর্বনাশ হবে। গোলাপকুমারের মৃত্যু হবে নিশ্চিত। এই ভয়েই রাজা চন্দনদেব তাঁর ভগ্নিপতি রাজা দেবপালকে-ও জানান নি তাঁর বোনের খবরাখবর। ঘোরা পথে বিশেষ কৌশলে কাজ হাসিল করতে হবে। সবার আগে উপযুক্ত গুপ্তচর পাঠিয়ে সংগ্রহ করে আনতে হবে রাজা দেবপালের রাজপ্রাসাদের হাল খবর। বিশেষ করে জানতে হবে রানী কালিন্দীর মহলের এখনকার হালচাল।

গুরুত্ব বুঝে রাজা চন্দনদেব পাঠালেন তার এক বিশেষ ওস্তাদ গুপ্তচরকে। সাত দিন পর সব খবর এসে গেল। চন্দনদেব ভাবতে থাকলেন, কী করা যায়। ভেবে ভেবে থই পান না তিনি। তাঁর রাজসভায় ছিল এক জন মহাগুণী ব্যক্তি। তার নাম গুণরাজ। অভিনয়, গান আর যাতুবিদ্যায় তিনি মহাকৃতী। সাবিত্রী তাঁর প্রিয় ছাত্রী। তাঁকে গিয়ে সাবিত্রী বলে এই মহা সমস্যার কথা। সব শুনে গুণরাজ ভাবেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন —"তুমি তো আমার সেই 'ধার করা আংটি পুটুলি বেঁধে জলে ফেলে দেবার যাতুটার' কথা জানো?"

"হ্যাঁ, গুরুদেব। তার পরে সেই জলে ফেলে দেওয়া আংটিটা তো ফিরিয়ে আনেন যাতু মন্তরে।"—সাবিত্রী জবাব দেয়।

"সেই কৌশলটা কাজে লাগালেই কার্য সিদ্ধ হবে। প্রথমে যুৎসই করে বানিয়ে নিতে হবে কাগজের ঠোঙাটা। তোমাকে তো শিখিয়ে দিয়েছিলাম ঠোঙা বানানোর কৌশল। তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেল দিকিনি একটা ঠোঙা।"

তক্ষুণি কাগজ, কাঁচি আর আঁঠা নিয়ে কাজে লেগে পড়ে সাবিত্রী। কাগজ নিয়ে একই মাপের তুটো ঠোঙা বানায় সে। আজকাল দোকানে চিনি ময়দা ইত্যাদি বেচার জন্য যেমন ঠোঙা দোকানীরা ব্যবহার করে ঠিক তেমনি তুটো ঠোঙা। এই তুই ঠোঙার একটার গলার দিকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে প্রায় অর্ধেকটা বাদ দিয়ে দেয় সে। এর ফলে সেই ঠোঙাটা চওড়ায় থাকে অন্যটার সমান কিন্তু লম্বায় হয় অন্যটার প্রায় অর্ধেক। এই ছোট ঠোঙাটার গলার কাছে, বাইরের দিকে চারপাশ ঘুরিয়ে আচ্ছা করে আঁঠা মাখিয়ে নেয় সাবিত্রী। তারপর সাবধানে এই ছোট ঠোঙাটাকে সে ঢুকিয়ে নেয় বড় ঠোঙার ভেতরে। এমন মাপে ঢোকায় যাতে তুটো ঠোঙার খোলা মুখের ধার একত্র মিলে যায়। এই অবস্থায় সাবিত্রী আঙুল দিয়ে টিপে টিপে তুই ঠোঙার মুখ

সাবধানে একত্র টিপে দেয়। আঁঠার গুণে সেঁটে যায় ছোট ঠোঙার খোলা মুখের বাইরের ধারটা বড় ঠোঙার মুখের অংশটার ভেতরের পিঠের সঙ্গে। কিছুক্ষণ এই ভাবে একত্র অবস্থায় চাপা দিয়ে রেখে সাবিত্রী তুলে ধরে তৈরী ঠোঙা। গুণরাজও পরীক্ষা করে দেখে। নিখুঁৎ হয়েছে। হাত থেকে আংটি খুলে গুণরাজ সেটা ফেলে ঠোঙার মুখে। আংটিটা ছোট ঠোঙার তলায় গিয়ে ঠেকে—বড় ঠোঙার তলা অবধি পৌঁছয় না। গুণরাজ সাবিত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে—"আংটির খেলা দেখানোর সময় আমরা একই মাপের আর একই রঙের তুটো ছোট রেশমী রুমাল নিয়ে তার একটার মধ্যে একটা সাধারণ পেতলের আংটি পুরে পেচিয়ে দলা পাকিয়ে নেই। এই পেতলের আংটিপোরা রেশমী রুমালের ঢেলাটা আমরা আগে বড় ঠোঙার তলায় রেখে তার পরে ছোট ঠোঙাটা তুমি যেমন করে সেঁটেছ তেমনি করে আঁঠা দিয়ে সেঁটে নিই। এই ভাবে প্রস্তুত কাগজের ঠোঙা নিয়েই শুরু হয় আমাদের খেলা। দর্শকের কাছ থেকে দামী আংটি ধার করে নিয়ে সেটাকে জড়াই একই আকার-প্রকার ও রঙের দ্বিতীয় রুমালটা দিয়ে। পেতলের আংটিটা যে ভাবে জড়ানো হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে জড়িয়ে ঢেলা পাকিয়ে ফেলে দেই এই কাগজের ঠোঙার মুখ গলিয়ে ভেতরের দিকে। সবাই ভাবে সেটা গিয়ে হাজির হল ঠোঙাটার তলায়। কিন্তু আসলে তা গিয়ে ঠেকে থাকে বড় ঠোঙার মাঝ বরাবর ছোট ঠোঙার তলায়।

"এর পর তো শক্ত ফিতে দিয়ে ঠোঙাটার মুখ আচ্ছা করে বেঁধে সেটাকে দেন এক সহকারীর হাতে ফিতের গাঁঠের প্রান্ত ধরে শূন্যে সবার চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখার জন্য। এর পর কী মনে হতে, সন্দেহ দূর করার জন্য আপনি এক টানে ঠোঙার তলা ছিঁড়ে বের করে আনেন সেই আংটি জড়ানো রেশমী রুমালের কুণ্ডলী।" গড় গড় করে বলে সাবিত্রী।

"ঠিক বলেছ। এর পর দর্শকদের একজন আরো কয়েকজন দর্শকের পাহারায় সেই আংটি জড়ানো রেশমী রুমালের কুণ্ডলী ফেলে দিয়ে আসেন জলে। ছেঁড়া ঠোঙাটা হাতে নিয়ে অন্তরালে চলে যায় সহকারী। একান্তে আড়ালে বসে সে খুলে ফেলে ঠোঙা। বের করে আনে দ্বিতীয় রুমাল জড়ানো আসল আংটি আর কৌশলে পৌঁছে দেয় আমার হাতে সকলের অগোচরে। নকল আংটিটাকে আসল মনে করে জলাঞ্জলি দিয়ে দর্শকেরা যখন ফিরে আসে তখন আমি রহস্যময় ভাবে তাদের সামনে তুলে ধরি এই আসল আংটি। সবাই অবাক হয় তাই দেখে।"—কৌশল প্রকাশ করে গুণরাজ।

"তাহলে আপনি বলছেন যে আমি প্রথমে বানিয়ে নেব সেই হারের মতনই দেখতে আর একটি সোনার হার। সেই হার বড় কাগজের ঠোঙার তলায় ভেতরে রেখে তার পরে গলাবো ছোট ঠোঙাটা আর আঁঠা দিয়ে একত্র সেঁটে নোব ছুটো ঠোঙার খোলা মুখ। এই জোড়ার ব্যাপারটা এমন হবে যাতে মুখ দিয়ে হাত গলালে সে হাত ছোট ঠোঙার ভেতরে গলে। বড় ঠোঙার মুখের ভেতরের পিঠ আর ছোট ঠোঙার মুখের বাইরের পিঠ একসঙ্গে আঁঠায় সাঁটা থাকবে আচ্ছা করে। তাই তো?" সাবিত্রী খোলসা করে ব্যাপারটা।

"ঠিক ধরেছ, বৎসে। রানী কালিন্দীর কাছ থেকে হার হাতিয়ে তুমি ঠোঙায় ভরে ঠোঙার মুখ আাঁট করে বেঁধে রাখবে ফিতে দিয়ে। তারপর তাড়াতাড়ি বের করার সময় ঠোঙার তলা ফাটিয়ে তোমার তৈরী হারটা ফেরৎ দিয়ে আসবে তাঁকে। ছেঁড়া ঠোঙাটা ভালয় ভালয় নিয়ে আসতে পারলেই সেই সঙ্গে তোমার আসল জিনিস এসে যাবে তোমার ঘরে। বাকি ব্যাপার ভেবে চিন্তে ঠিক করতে হবে রাজা মশাই আর তোমার শাশুড়ী ঠাকুরানীর সঙ্গে পরামর্শ করে। গুপ্তচর কী খবর এনেছে তাও বুঝে নিয়ে কাজে লাগাতে হবে এই ব্যাপারে।" কথা শেষ করে বিজ্ঞ গুণরাজ।

রাজা চন্দনদেব, রূপমতি, গুণরাজ, সাবিত্রী আর গোলাপকুমার সে দিন মাঝরাতে বসলো, এক মন্ত্রণাসভায়। গুপ্তচর খবর এনেছে, রানী কালিন্দীর পায়ে হয়েছে এক অদ্ভুত ধরনের ঘা। নানা চিকিৎসায়ও সারছে না সে ঘা। রাজা দেবপাল ঘোষণা করেছেন, রানীর পায়ের এ ঘা যে সারাতে পারবে তাকে তিনি দেবেন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। অনেক বদ্যি এসেছে, চিকিৎসা করেছে কিন্তু সারাতে পারে নি সে ঘা। রানী কালিন্দীর মনে শান্তি নেই। যন্ত্রণার শেষ নেই তাঁর।

"আমাদের বৈদ্যরাজ তো সব রোগের যম। তাঁর কাছ থেকে পায়ের ঘায়ের কোন মহৌষধ যদি পাওয়া যায় তবেই তো কেল্লা ফতে করা যায়। সেই ওষুধ নিয়ে সাবিত্রী ছদ্মবেশে যাবে কালিন্দী রানীর মহলে। চিকিৎসা করবে আর কোনও কৌশলে হার হাত করবে।" রাজা চন্দ্রদেব বলেন।

"প্রস্তাব উত্তম। বৈদ্যরাজ 'পাদপাদপ' নামে যে বিশেষ গাছটি চীনদেশ থেকে আনিয়েছেন তা নাকি সব পায়ের ঘায়ে প্রত্যক্ষ ফল-দায়ক। বৈদ্যরাজের কল্যাণে যদি মহৌষধ পাওয়া যায় তবে তো সব মুস্কিল আসান হয়। বাদ বাকি কাজ মা সাবিত্রী আমার সুযোগ্য শিষ্যার মত সুচারু ভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। ওর ছেলেটিকে সঙ্গে দিলে কাজ সহজ হবে বলে মনে হয়। তিন বছরের ছেলে অঙ্কুর চটপটে, বুদ্ধিমান। ওর সুন্দর কচি মুখ দেখিয়ে ও বন্ধ্যা রানী কালিন্দীর মনও কিছুটা নরম করতে পারবে সাবিত্রী।" প্রস্তাব সবার মনে ধরে।

বেতের চুপড়িতে হাত পা পরিচর্যা করার নানা সামগ্রী আর বৈদ্যরাজের বানানো পাদপের রস মেশানো পায়ের ঘায়ের ওষুধ নিয়ে ছেলে সহ নৌকার সওয়ার হল সাবিত্রী। দেবগিরির ঘাটে নৌকা বাঁধা হল। ছেলের হাত ধরে চুপড়ি বগলে সাবিত্রী গিয়ে হাজির হল রানী কালিন্দীর মহলের দোরগোড়ায়। "রানীমার

পা সারাতে এসেছি গো।” দ্বাররক্ষীকে চটুল গলায় বললো নাপতেনী বেশিনী সাবিত্রী।

অল্প পরেই তার ডাক পড়লো কালিন্দীর অন্দরমহলে। ছেলে কোলে সে গিয়ে ঢুকলো রানীর খাশ কামরায়। শুরু করলো পদসেবা। তার মিষ্টি ব্যবহার আর সরস কথাবার্তা দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে খুশি করে ফেললো কুটিল রানী কালিন্দীকে। রানীর গলায় ঝকঝক করছে সেই হার। যার হুবহু নকল আরো একটি হার সে এনেছে তার সঙ্গে কাগজের ঠোঙার গুপ্তফোকরে লুকিয়ে। তার শাশুড়ী রূপমতির স্মরণশক্তির তারিফ না করে পারে না সে। কি নিখুঁত ভাবেই না তিনি চন্দনদেবের প্রাসাদের স্যাকরার কাছে দিয়েছিলেন এই অমূল্য স্বর্ণহারের মাপ আর আকার-আকৃতির বর্ণনা। কি বিপুল ধৈর্যের সঙ্গেই না তিনি ঐ স্যাকরাকে দিয়ে হুবহু একই হার আর একটি বানিয়ে দিয়েছেন।

সযত্নে সৎশাশুড়ীর পদসেবা করলো সাবিত্রী। মহৌষধ লাগিয়ে দিল অতি সাবধানে। হাত পায়ের নখ কেটে, আঙ্গুল মট্‌কে আরাম দিয়ে চিত্র-বিচিত্র করে আলতা পরিয়ে দিল সে রানী কালিন্দীকে। আরাম পেয়ে আর হাত পায়ের বিচিত্র সজ্জা দেখে তো রানী মহাখুশি। নিঃসন্তান কালিন্দী আদর করে ফুটফুটে ছেলে অঙ্কুরকে কোলে তুলে নিলেন। তাকে সোহাগ করতে লাগলেন তিনি পরম আদরে। অঙ্কুরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা, মিষ্টি হাসি আর সুডোল মুখাকৃতি একদিনের দর্শনেই জয় করে নিল কালিন্দীর মন।

কাজ শেষ করে সাবিত্রী ফিরে এলো নৌকায়। পরের দিন বিকালে আবার গেল কালিন্দীর মহলে। মনে হল যেন ওষুধে কাজ হচ্ছে। সেদিনও পদসেবা করে ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে নৌকায় ফিরে এলো সাবিত্রী। এমনি ধারা চললো পর পর চারদিন।

পায়ের ঘা প্রায় সেরে এসেছে। জ্বালা-যন্ত্রণা একদম নেই। কালিন্দীর মন তাই খুশি খুশি। সাবিত্রীর প্রতি তাঁর দরদ তাই উথলে ওঠে। তাই তো, এমন সুন্দর শান্ত স্বভাবের সুন্দরী গুণী মেয়ে, তার স্বামী কিনা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। অসহায়া মেয়েটা তাই দশজনের পদসেবা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ বিদেশের ঘাটে ঘাটে, সদুপায়ে পেটে ভাত জোগার করার জন্য। ফুটফুটে, সুন্দর ফুলের মত ছেলেটার জন্যও মায়া মমতা হয় না পাষণ্ড বাপটার!

সাবিত্রী এলো। যথারীতি পদসেবা শুরু করলো সেদিন। পায়ের পটি পালটে সবে ওষুধ লাগাতে যাচ্ছে অমনি বায়না ধরলো অঙ্কুর—"আমি রানীর হার গলায় পরবো।" খ্যান খ্যান করে কান্না জুড়ে দিল সে। "রানীর হার পরে আমি রানী সাজবো।" কান্না আরো এক পর্দা উঠলো।

"নে আমার এই পুঁতির হার পর। কান্না থামা। শান্তিতে কাজ করতে দে।"

"না তোমার হার নেব না। তুমি কি রানী? আমি রানীর গলার ঐ হার চাই।" চিৎকার করে উঠলো অঙ্কুর।

রানী কালিন্দীর কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচুগলায় ফিস ফিস করে সাবিত্রী বললো, "কিছু মনে করবেন না রানীমা, ছেলেটা বড় বেয়াড়া। অল্পক্ষণের জন্য হারটা দিন। গলায় পরে বা হাতে রেখে নোংরা করতে দেব না ওকে এ হার। দিন, এই কাগজের ঠোঙায় ভরে ফিতে দিয়ে শক্ত করে মুখ বেঁধে ওর হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি। সেই ফাঁকে ওকে খেতে দিচ্ছি ওষুধ মেশানো মিশ্রি। এই মিশ্রি খেলে অল্প পরেই ও ঘুমিয়ে পড়বে। ততক্ষণে আমার ওষুধ লাগানোও হয়ে যাবে। আপনার হার আপনাকে দিয়ে আমি চলে যেতে পারবো। ওকে কোলে করে নিয়ে

যেতে কোন কষ্ট হবে না আমার। এক কাঁধে ঝোলা আর এক কোলে ওকে নিয়ে চলে যাব নৌকাঘাটে।

যেন কিছু হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে রানী কালিন্দী গলা থেকে হার খুলে সাবিত্রীর হাতে দিলেন। ঝোলা থেকে একটা কাগজের
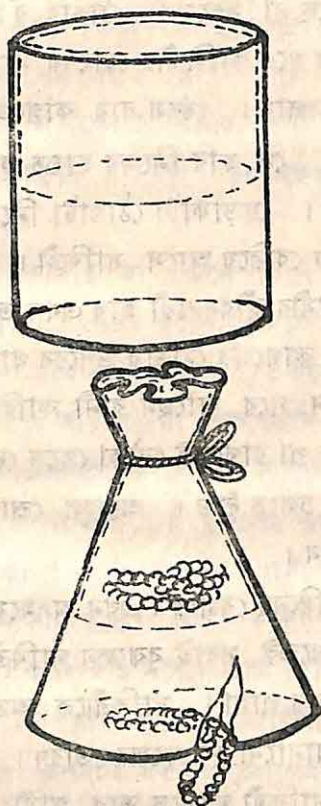
খালি ঠোঙা বের করে তার ভেতরে সাবিত্রী ছেড়ে দিল সেই হার। তার পর একটা ফিতে দিয়ে আচ্ছা করে এঁটে সে বেঁধে দিল ঠোঙাটার মুখ।

" নে হতচ্ছাড়া ছেলে। বাপ যেমন এক রোখা গোঁয়ার, ছেলেও হয়েছে তেমনি। তিরস্কারের স্বরে ছেলের দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে সাবিত্রী তার হাতে দেয় ঐ কাগজের ঠোঙা। তার পরে ঝোলা থেকে এক ঢেলা মিশ্রি বের করে গুঁজে দেয় ছেলের মুখে। কাগজের

ঠোঙা হাতে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে মিশ্রি চুষতে থাকে অঙ্কুর। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

কাজ শেষ হতে ঘুমন্ত অঙ্কুরের হাত থেকে ঠোঙাটা নিয়ে তার মুখের ফিতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করে সাবিত্রী। বাঁধন বড্ড এঁটে গেছে। খুলছে না সহজে। ঠোঙার বাঁধা মুখটা বাঁ হাতে ধরে ঠোঙাটা উঁচু করে ধরে কালিন্দীর চোখের সামনে সাবিত্রী ছুরির ঘা বসায় ঠোঙাটার তলায়। ফেঁসে যায় কাগজের ঠোঙার তলা—মাটিতে পড়ে হার। সে হার নিজের হাতে কুড়িয়ে নিয়ে গলায় পরেন রানী কালিন্দী। ছেড়াফাঁটা ঠোঙাটা নিজের ঝোলায় পুরে, ছেলেকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসে সাবিত্রী। আর দেরী নয়। কাজ হয়ে গেছে। স্বামীর জীবনদায়ী হার এখন তার নিজের দখলের তার ঝোলার মধ্যে। কাগজের ঠোঙার উপরের খাপে। নিচের খাপে রাখা নকল হার এখন পরে আছেন রানী কালিন্দী। হাসি-খুশি মুখে সাবিত্রী নৌকায় পা রাখতেই নৌকা ছেড়ে দেয় মাঝি। দুজন দাঁড়ির হাতে সমানে চলছে দাঁড়। অনুকুল স্রোতের টানে ছুটছে নৌকা রুদ্রপুরের পানে।

গভীর রাতে নয়, দিনের বেলায়। এখন অসময়ে গোলাপকুমারের দেহে প্রাণ ফিরে আসতেই সবাই বুঝলেন সাবিত্রী সফল হয়েছে। এখন তার ঘরে ফেরার পালা। সাবিত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রুদ্রপুরের ঘাটে বানানো হল ফুলের তোরণ। না ঘুমিয়ে রাত কাটালেন সবাই। সাবিত্রী আসছে তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে নিয়ে।

পরের দিন সকালে রানী কালিন্দীর মন ভাসতে থাকলো আনন্দের সায়রে। তাঁর পায়ের ঘা বেমালুম সেরে গেছে। জ্বালা-যন্ত্রণা তো দূর হয়েছিল আগেই। দাগটাগও নেই। যার সেবায় এই অসম্ভব সম্ভব হল তাকে মনের মত পুরস্কার দিতে হবে। সে আসবে বিকালে। কালিন্দী বিকালের জন্যও অপেক্ষা করতে

পারছেন না যেন। মন্থরাকে পাঠান তিনি নদীর ঘাটে সাবিত্রীকে নিয়ে আসার জন্য। মন্থরা সাবিত্রীর নৌকা খুঁজে পায় না ঘাটে।

সাবিত্রী তো ততক্ষণে পৌঁছে গেছে নিজের দেশে তার প্রার্থীত নিধির দখল নিয়ে। হার নিয়ে সাবিত্রী তুলে দিলো তার শাশুড়ীর হাতে। প্রণাম করে তিনি সে হার তুলে রাখলেন সিন্দুকে। সাবিত্রীর আদরের শেষ নেই। সবাই বলে ধন্যিমেয়ে সাবিত্রী। সার্থক তার নাম। অতীতের সাবিত্রীর মতনই কাজ করেছে সে।

"এবার কী করণীয় মামা?" চন্দনদেবকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে গোলাপকুমার।

"তুমি আর তোমার মা দুজনে দেশে ফিরে গিয়ে তোমার বাবাকে সব জানাও।" উত্তর করেন চন্দনদেব।

" না সেটা ঠিক হবে না। হার বেহাত হয়েছে জানতে পারলেই কালিন্দী রানী আবার তার নষ্টামী শুরু করবে। তুমি বরং নিজে গিয়ে সাদরে তোমার ভগ্নিপতি দেবপাল আর তার রানী কালিন্দীকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসো এখানে।" বললেন রূপমতি।

সেই অনুযায়ী রাজা দেবপাল আর রানী কালিন্দী এলেন রুদ্র-পুরে চন্দনদেবের অতিথি হয়ে। প্রহরী পরিবৃত এক কামরায় রাজা দেবপাল আর রানী কালিন্দীর সামনে এনে হাজির করা হল রূপমতি, গোলাপ, অঙ্কুর আর সাবিত্রীকে। সাবিত্রীকে দেখেই কালিন্দীর বুক শুকিয়ে গেল। রূপমতি সব কথা বললেন।

বজ্রহুংকার ছেড়ে দেবপাল বললেন, "রাক্ষসী কালিন্দীকে এক্ষুণি বধ কর।"

চন্দনদেব বললেন, "বিচার যখন আমার রাজ্যে বসে হচ্ছে তখন আমার মতেই হোক, প্রাণ নিয়ে কাজ নেই। আজীবন কারাবাসই এর দণ্ড হোক।"

রাজা দেবপাল বললেন—"আচ্ছা তাই হোক।"

——

দজ্জাল ব্রাহ্মণী

এক ব্রাহ্মণ নাম তার ললিত। সোনারপুর গাঁয়ে ছিল তার সাত পুরুষের ভিটে। অবস্থা খুব সচ্ছল নয়, তবুও কোনও ভাবে চলে যায় তার দিন। আশপাশের নানা গাঁয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তার শিষ্য আর যজমানের বাড়ি। প্রায় দিনই সে পেতো পূজার দক্ষিণা, কলাটা-মূলোটা যজমান-শিষ্যদের বাড়ি থেকে। আর যাই হোক, খাওয়া-পরার অভাব ছিল না। প্রায়ই সে ছুচার দিনের জন্য ভিনগাঁয়ে চলে যেত যজমানের বাড়িতে নানা ক্রিয়াকর্মের জন্য। ফেরার সময় পোটলা বেঁধে নিয়ে আসতো তার পাওনা সামগ্রী—ফল-পাকুড়, চাল-ডাল, কাপড়-গামছা।

তার বউ স্নুরভির কিন্তু মন ভরতো না এসব কিছুতে। সব সময়ে সে বামুনকে দেখতো খুব ছোট নজরে। দিনরাত কোমর বেঁধে ঝগড়া করতো সে ললিতের সঙ্গে। কোন ছুতো না পেলে সে তার নিজের অদৃষ্টের দোহাই দিয়েই শুরু করে দিত কোন্দল। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দু-এক দিনের জন্য বাড়ি ফিরেও ক্ষণেকের

শান্তি পেতো না ললিত। একটু যে বসে শাস্ত্রালোচনা করবে তারও জো ছিল না ললিতের। তার যারা বন্ধু-বান্ধব তারাও তার বাড়িতে পা দেবার ভরসা পেতো না সুরভির ঝগড়াটেপনার ভয়ে।

প্রতিবেশিদের সঙ্গেও নিরন্তর চলতো সুরভির কলহ আর চেচামেচি। সব সময়ে সে খুঁজে বেড়াতো ঝগড়াঝাটি বাঁধানোর সুযোগ। সুযোগ না পেলে সে অহেতুক গায়ে পড়ে কলহের সূত্রপাত করতো।

ললিত নিজে ছিল এক নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় প্রকৃতির লোক। পাড়াপড়শী, নিকট-দূর, আপন-পর সবাই ভালবাসতো তাকে। এক সুরভিরই সে ছিল ছু চক্ষের বিষ। তাকে দেখলেই যেন সুরভি জ্বলে উঠতো তেলেবেগুনে। তার বাতাসই বুঝি সহ্য হত না সুরভির।

বাড়ি ফিরলেই আশপাশের লোকজনের মুখ থেকে শুনতে হত সুরভির ঝগড়াঝাটির নানা কথা। ললিতের মন হয়ে উঠতো আরো খারাপ। তাই তার ইচ্ছা করতো বাড়িতে না ফিরতে। কিন্তু উপায় কী? ছেলে-মেয়ে, বউ, সংসার এসব ছেড়ে বেশী দিন বাইরে থাকতে মন চাইতো না ললিতের। এত ছুর্ব্যবহার সত্বেও সে মনেপ্রাণে ভালবাসতো সুরভিকে। সুরভির একটু মাথা ধরলেও সে দিশেহারা হয়ে পড়তো। বদ্যিবাড়ি ছোটাছুটি করতো বারে বারে, টোটকা ওষুধের খোঁজে চষে ফেলতো বনবাদাড়! কিন্তু তবুও সুরভির মুখ থেকে একটু মিষ্টিকথা শুনতে পেতো না সে কোন সময়ে। ভুল করেও কোন দিন তাকে ছুটো মিষ্টিকথা সুরভি কখনো শুনিয়েছে কিনা ললিত স্মরণ করতে পারে না সে কথা।

তাই বলে স্বামীর প্রতি সুরভির যে মোটেই টান ছিল না তা নয় কিন্তু। বাইরে বেরিয়ে যাবার পর ললিত যতক্ষণ না সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরে আসছে ততক্ষণ সুরভির প্রাণে শান্তি বা স্বস্তি

কিছুই থাকতো না। ললিত বেরিয়ে গেলেই সুরভির মন কাঁদতো ললিতের জন্য। বারেবারে সে ঠাকুরকে ডাকতো যাতে ললিত নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসে সেজন্য। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করতো, আর সে খারাপ ব্যবহার করবে না ললিতের সঙ্গে। তার মনে আঘাত লাগে, সে মনে কষ্ট পায় এমন কথা বলবে না বা এমন কাজ করবে না। কিন্তু ললিত ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সুরভি বেমালুম ভুলে যেত তার সব শপথ, সব প্রতিজ্ঞা। ললিতের মুখ দেখামাত্র না জানি কী কারণে সে জ্বলে উঠতো—শুরু করে দিত দুর্ব্যবহার। একটু স্বস্তিতে বসতেও সে দিত না ললিতকে। নানা বাক্যবাণে জর্জরিত করতো সে ললিতকে। অশান্তির আগুন ধরিয়ে দিত সে ললিতের মনে-প্রাণে। এসব ললিতের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাই ইষ্টদেবতার নাম করতে করতে সে সামলে নিত নিজেকে। অদৃষ্টের পরিহাস বলে মেনে নিত সে এসব কিছু। ললিতের ছিল এক ছেলে এক মেয়ে। তারা খুব ভালবাসতো ললিতকে। তারা বারেবারে মাকে বলতো—"মা, বাবাকে কেন তুমি অকারণে এমন করে জ্বালাও?"

সুরভি ধমক মেরে চুপ করিয়ে দিত তাদের। ছেলেমানুষ, ভয়ের চোটে চুপ করে যেতো তারা। মনে মনে কষ্ট পেতো ছেলেমেয়েরা।

সব থেকেও যেন কিছু নেই। এই ছিল ললিতের অবস্থা। বউ-এর কাছ থেকে একটু আদর, একটু ভাল ব্যবহার এই পেলেই যেন ললিতের জীবনের সব কিছু পাওয়া হয়ে যেত। কিন্তু বিধি বিরূপ। ললিতের জীবনে শান্তি বুঝি কোন দিন আর আসবে না। কায়মনবাক্যে ললিত প্রার্থনা জানায় তার ইষ্টদেবতার কাছে—"প্রভু, সুরভির সুমতি হোক।"

এমনি করেই কাটে ললিতের দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর। এক বার দিনচারেক ভিন গাঁয়ের যজমানবাড়িতে পূজাপার্বণ সেরে ভর

দুপুরে বাড়ি ফিরলো ললিত। কাঁধে ঝোলানো পুটলীতে যজমানের দেওয়া নানা ফল, মিষ্টি, কাপড়-চোপড়। বাঁ হাত থেকে ঝুলছে একটা সের দুয়েক রুই মাছ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরে দোর দিয়ে ঘুমুচ্ছিল সুরভি। দাওয়ার উপরে পুটলী নামিয়ে রেখে আদুরে গলায় মিষ্টি করে ললিত ডাকলো—"অ বউ, অ বউ, দেখো তোমার জন্য কী এনেছি।"

"আমার জন্য আবার কী ছাই আনবে? এখন আর ষাঁড়ের মত চেচামেচি কোরো না। আমাকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও।"

ললিতের উৎসাহ কমলো না এতে। মাছটাকে উঁচু করে ধরে সে গিয়ে দাঁড়ালো বউ-এর বিছানার পাশে—"লক্ষ্মীটি, দেখো, চোখ খুলে দেখ না কী এনেছি তোমার জন্যে।"

"আমার মাথা আর তোমার টিকিওয়ালা মুণ্ডু। ভাল জিনিস কাকে বলে তা কি দেখেছ কখনো যে আনবে?"—সুরভি এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুম জড়ানো চোখে ললিতের হাত থেকে মাছটাকে কেড়ে নিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল ঘরের পেছনের নোংরা আস্তাকুড়ে। তারপরে দাওয়ায় এসে হাত ধুয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লো নিজের বিছানায়।

সকাল থেকে চড়া রোদে পায়ে হেঁটে কয়েক ক্রোশ পথ এসেছে ললিত। ক্ষিধেতে পেট চোঁ চোঁ করছে। শ্রান্তি আর ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসছে শরীর। ঝট্ করে এক ঝলক রক্ত এসে চাপল তার মাথায়। অনেক কষ্টে দমন করলো সে তার রাগ। একটা চাপা অভিমান গুমড়ে উঠলো তার বুকের মধ্যে। তার বিয়ে করা বউ, যাকে সে এত দিন ধরে এত যত্নে ভরণপোষণ করছে তার একটু দরদ, মায়া-মমতা নেই তার উপরে। কেমন আছে তা জানাও দরকার বোধ করলো না। সে খেয়েছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করলো না। কাছে এসে একটু দাঁড়ালো না পর্যন্ত!

আত্ম-ধিক্কারের এক চরম বিষ ছেয়ে ফেললো ললিতের সারা মন-প্রাণ। নিজের জীবনের প্রতি এক কালো বিতৃষ্ণা চেপে ধরলো তাকে। মনে মনে বললো সে—"কী হবে এ জীবন রেখে?"

এক ছুটে বেরিয়ে এলো সে তার বাড়ি থেকে। কিছু দূরেই নদী। কলকলিয়ে বয়ে চলেছে মাতাল নদীর দামাল স্রোত। নদীর ধারে এক টিলার উপরে উঠে দাঁড়ালো ললিত। তার বেদনা ভরা বুকে এখন বাজছে শুধু একটি কথা—এ জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। জলে ডুবেই মরবে সে। কিন্তু জলে ঝাপিয়ে পড়লেই তো সে মরবে না। সে যে সাঁতার জানে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ললিত খুঁজে পায় একটা ভারী পাথর। নিজের গায়ের চাদর দিয়ে সে এই পাথরের চাঙ্গরটাকে বেঁধে নেয় নিজের কোমরের সঙ্গে। ব্যাস, এইবার সে প্রস্তুত। দুর্গা দুর্গা বলে এইবার নদীর শীতল স্রোতে ঝাঁপ দিলেই তার চির শান্তি।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

"এ কী করছো তুমি, ললিত? পাগল হয়ে গেলে না কি?"

ললিত পেছন ফিরলো। দেখলো তার বন্ধু সোমনাথ তার শরীর জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে।

"না ভাই সোমনাথ, আর বাচার সাধ নেই আমার। বউ-এর জ্বালা আর সইতে পারছি না আমি। জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে, ভাই। আমাকে মরতে দাও।"

"বউ-এর কাছে হেরে গিয়ে তুমি ইহকাল পরকাল নষ্ট করবে। জান না আত্মহত্যা মহাপাপ? তা ছাড়া তোমার ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তারা তো কোন অপরাধ করে নি?"

"কিন্তু কী করবো ভাই, এ জ্বালা যে আর সহ্য হয় না। এ অবহেলা পুরুষ মানুষ হয়ে কী করে সহ্য করি, ভাই সোমনাথ?"

"তোমার এ জ্বালার উপশমের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। এখন আমি যা বলি তাই শোন; এদুর্মতি ত্যাগ কর। আমার বাড়ি

চল। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করবে। বাদ বাকি যা কিছু করার আমিই করবো। তোমাকে আর এখন বাড়ি ফিরতে হবে না। এখন তুমি মৃত। আমার ম্যাজিকের উপর তো তোমার অগাধ বিশ্বাস। সেই ম্যাজিক দিয়েই যদি তোমার ঘরে চিরতরে শান্তি না আনতে পারি তবে তুমি তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই কোরো। আমাকে ভাই, একটা সুযোগ দাও।"

প্রিয়বন্ধু সোমনাথের কথায় ললিত শান্ত হল। শরীর থেকে পাথর খুলে ফেলে সে এগিয়ে চললো সোমনাথের বাড়ির দিকে। তার বাড়ির ভেতর দিককার একটা আড়ালের ঘরে সোমনাথ এনে তুললো ললিতকে। স্নানাহার শেষ করে ললিত শান্ত হয়ে আরামে বসলো। কোন ভাবে কী করবে, তার এক খোলাখুলি বিবরণ সোমনাথ শোনালো ললিতকে। ললিতের মনে ভরসা হল সোমনাথের কথায়।

সেই দিনই সন্ধাবেলায় ধূপধূনো জ্বেলে তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিচ্ছিলো সুরভি। এমন সময় সেই ভরসন্ধ্যায় এক আবছায়া মূর্তি এসে দাঁড়ালো তার তুলসীমঞ্চের উল্টো দিকে। হর হর ব্যোম ব্যোম···ধ্বনি তুলে সেই মূর্তি এগিয়ে এলো সুরভির দিকে। ভয়ার্ত গলায় সুরভি চিৎকার করে উঠলো –"কে ? কে ?"

ধীর পায়ে এগিয়ে এলো এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলতে থাকলো, "অলক্ষুণে হতচ্ছারী, এখনো তুই সধবার চিহ্ন শাঁখা-সিঁদুর, রঙ্গীন কাপড় পরে আছিস ?"

"হারামজাদা সাধু, এখুনি দূর হ আমার সামনে থেকে। সধবা সতী আমি। সধবার চিহ্ন পরবো না তো কী পরবো রে নির্বংশের বেটা ? জলজ্যান্ত স্বামীর বউ আমি। আমাকে তুই বিধবা ভাবছিস কোন্ সাহসে ?

সাহসের কথা নয়। যা সত্যি তাই বলছি। অপঘাতে মরেছে তোর স্বামী। আত্মঘাতী হয়েছে সে। মহাকালীর মন্দিরে

নিজের গলায় খাঁড়ার কোপ মেরে জীবন দিয়েছে তোর স্বামী। আমি নিজের চোখে দেখেছি সব কিছু।”

“বিশ্বাস হয় না। তবু চল দেখে আসি একবার নিজের চোখে।” দ্বিধার সঙ্গে সুরভি এগিয়ে চলে সন্ন্যাসীর সঙ্গে মহাকালীর মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে তাকায় সুরভি। দৃশ্য দেখে আৎকে ওঠে সে। বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। দুপা অবশ, ভারী হয়ে পড়ে। মাথা ঘুরতে থাকে তার। এ কী দেখছে সে? একটা চক্‌চকে রামদার ধারালো ফলা ললিতের শ্বাসনালী আর গলার প্রায় সবটুকু কেটে বসে গেছে…দর দর করে গড়িয়ে পড়ছে ঘন লাল রক্তের ধারা…মরে কাঠ হয়ে রক্তাক্ত মেঝের উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে তার স্বামী ললিত।

“এ কি হল গো?—আমার এ কি সর্বনাশ তুমি করলে গো?” —এক বুক-ভাঙা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো সুরভির কণ্ঠচিরে। জানালার গরাদের গায়ে মাথা ঠুকে সে বারে বারে আর্তনাদ করতে থাকলো।

কান্না শুনে মন্দিরের পুরোহিত এগিয়ে এসে সান্ত্বনার সুরে বললেন—“এখন আর কেঁদে কী হবে, মা? বেঁচে থাকতে তো আর তুমি ও বেচারীকে এক দণ্ডের জন্যও শান্তি দাও নি। ঝগড়া আর গঞ্জনায় তো বেচারীকে এক মুহূর্তও তিষ্ঠোতে দাও নি। তোমার জ্বালাতেই হতভাগা আত্মঘাতী হল শেষ অবধি।”

“ঠাকুর মশাই গো, সত্যিই বলেছেন। আমার জন্যেই মানুষটা মরেছে। আমি পাপিষ্ঠা। আমি পতিঘাতিনী। আমি নরকের কীট। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন। এ জীবন আমি আর রাখবো না। আমি সহমরণে যাব। আমার ও মরণ হোক এই মা মহাকালীর পায়ের তলায়।”

কথা শেষ করেই সুরভি মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করলো। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে সন্ন্যাসী আর পুরোহিত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অধীরা সুরভিকে জোর করে ধরে রেখে তার মাথা ঠোকা বন্ধ করলো। ধীর গলায় পুরোহিত বললো, "মা, তুমি এখন স্বামীর জন্য তোমার প্রিয় জীবন উৎসর্গ করতে চাইছো, কিন্তু স্বামী যখন বেঁচে ছিল তখন তার সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথাও তো বলতে না? সব সময়ই তো তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে কলহ-বিবাদে আর দুর্ব্যবহারে! যদি একটু ভাল ব্যবহার করতে তবে কি আর বেঘোরে মরতো বেচারী?"

"সত্যি বলেছেন ঠাকুরমশাই, আমি মহা পাপ করেছি। আমি পাপিষ্ঠা। কর্তব্য করি নি বলেই তো এখন আমি তার জন্য সাজা নিতে চাই নিজের হাতে। দয়া করুন, আমাকে মরতে দিন।" কথা শেষ করে অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে সুরভি।

সুরভির চোখের সামনেই সন্ন্যাসী হাত গলায় তার পিঠের ঝোলাতে। ঝোলা থেকে সে বের করে আনে একটা কিম্ভুতকিমাকার শিকড়। শিকড়টা উঁচু করে ধরে সন্ন্যাসী বলে—

"দেখ বাছা, এ হচ্ছে মৃতসঞ্জীবনী গাছের মূল। কামাখ্যা পাহাড় থেকে আমার গুরুর গুরু এই মূল এনেছিলেন আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে। এই শিকড়ের গুণে আমি এই মরা লোকটার জীবন ফিরিয়ে আনতে পারি। তবে হ্যাঁ, একটা বিশেষ শর্ত আছে। পুরোহিতমশাই এতক্ষণ যা কিছু বলেছেন সব শুনে বুঝলাম এই বেচারী সারাজীবন স্ত্রীর কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পায় নি বলেই আত্মঘাতী হয়েছে। যদি এর স্ত্রী মা মহাকালীর সামনে প্রতীজ্ঞা করে যে, আর কোন দিন সে এর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না, তবেই আমি একবার এর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করবো।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনে পুরোহিত ঠাকুর মুখ খুললেন। বিনয়ের সঙ্গে তিনি বললেন—

"হ্যাঁ বাবাঠাকুর, যদি সম্ভব হয় তবে তাই করুন। এ বেচারী অল্পবুদ্ধি মেয়েমানুষ। নিজের ভুলে খেয়াল বসে অপকর্ম করে বসেছে। ভগবানের কাছে এর পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এর স্বামী বেচারী যাতে প্রাণ ফিরে পায় তার ব্যবস্থা করুন দয়া করে। নাহলে এর ছেলেমেয়েরা সব অনাথ হয়ে মারা যাবে সংসারে এর আর কেউ নেই।"

পুরুতঠাকুরের কথায় সুরভি আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা খুঁড়ে বলতে থাকলো, "হ্যাঁ সন্ন্যাসীঠাকুর, একটু দয়া করুন এই হতভাগিনীর উপর। স্বামী না বাঁচলে আমি মরবো। মরবোই আমি। ছেলেমেয়ে দুটো সত্যিই ভেসে যাবে। জীবনভোর যে অপরাধ করেছি স্বামীর কথার অবাধ্য হয়ে, তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাঁকে কটু কথা শুনিয়ে, ঝগড়া করে আমি যে মহাপাপ করেছি, তার জন্য অনুশোচনার আগুনে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছি আমি এখন। পাড়া-পড়শির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে তাদের গালমন্দ করে জীবনভোর খুব অপরাধ করেছি আমি। করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে কায়মনবাক্যে ক্ষমা ভিক্ষা করছি আমি। ক্ষমা কি পাবো না আমি?"

"ক্ষমা চাইলেই হবে না। মা মহাকালীর সামনে তাঁর নামে শপথ নিতে হবে। বলতে হবে—আমি সব সময় স্বামীকে ভক্তি করবো। স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে মান্য করবো, ভালবাসবো, তাঁর অবাধ্য হব না। তাঁকে কটু কথা শোনাবো না। স্বামীর সঙ্গে বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করবো না কখনো। সব সময় স্বামীকে আদর-যত্ন করবো।"—কঠিন স্বরে বললো সন্ন্যাসী।

শোক-বিহ্বলা সুরভি মহাকালীর সামনে করজোড়ে উচ্চারণ করলো শপথবাক্য। মন্দিরের দরজা তখনো রয়েছে তালাবন্ধ।

শপথ শেষ করে সুরভি বললো, "পুরুতঠাকুর, দোরটা একটু খুলে দিন না, আমি আমার স্বামীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নিই আমার অপরাধের জন্য।"

"না মা, এখন তো মৃতদেহের কাছে তোমার যাওয়া চলবে না। দেখতে চাও তো জানালা দিয়ে দেখ যত খুশি। মৃতসঞ্জীবনী প্রয়োগ করতে হলে মৃতদেহে কারও হাত দেওয়া চলবে না আমি ছাড়া।"—কঠোর স্বরে বললেন সাধুবাবা।

"ঠিক আছে, তবে আমি জানালা দিয়েই ওকে দেখি। আপনারা যা করার করুন।"—কথা বলে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ায় সুরভি। তার দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুর বন্যা।

সন্ন্যাসীর নির্দেশে মন্দিরের তালা খোলেন পুরুতঠাকুর। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সন্ন্যাসীবাবা বলেন পুরুতঠাকুরকে, "ওকে স্মরণ করিয়ে দিন ওর শপথের কথা। এর একটি শর্তও যেন নড়চড় না হয় জীবনে।"

কাঁদতে কাঁদতেই সুরভি বলে, "সাধুবাবা, সব কথাই আমার স্মরণ থাকবে। কোন দিন ভুলবো না আমি শপথের কোনও শর্ত। আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলুন তাড়াতাড়ি।"

"বাঁচানো আমার হাতে নেই। সবই মা মহামায়ার ইচ্ছা। আমি মৃতসঞ্জীবনীর মূল প্রয়োগ করছি। বাকি সবই তাঁর করুণা।" —কথা বলে সন্ন্যাসী পা বাড়াল গলাকাটা ললিতের দিকে। শোকার্ত চোখে জানালা দিয়ে অধীর আগ্রহে দেখে সুরভি।

"কালি কালি মহাকালী, কালিকে পাপনাশিনী···"কালী স্তব উচ্চারণ করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করেন সন্ন্যাসীঠাকুর। তারপর, "তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"—বলে ভক্তি ভাবে মহাকালীর মূর্তিকে প্রণাম করে সন্ন্যাসীঠাকুর তার গায়ের গেরুয়া চাদরখানা দিয়ে আচ্ছা করে ঢেকে দেন ললিতের দেহটার আপাদমস্তক। বিড় বিড় করে কী এক মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এর পর সন্ন্যাসীঠাকুর চাদর ঢাকা ললিতের দেহের উপর কিছুক্ষণ ধরে হাত বুলোতে থাকেন। মৃতসঞ্জীবনীর মূলটা এবার ললিতের বুকের কাছে চাদরের উপরে রেখে সন্ন্যাসীঠাকুর চাদরের তলা থেকে টেনে বের করে আনেন রক্ত মাখা ধারালো রামদাখানা। রক্তমাখা রামদাখানা নজরে পড়তেই সুরভির বুকের কাছটায় কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে—ক্ষণিকের জন্যে বুঝি তার বোধশক্তি লোপ পেয়ে যায়।

সম্বিত ফিরে পেতে সে দেখে, সাধুবাবা ললিতের শরীর থেকে চাদরখানা সাবধানে লম্বালম্বি ভাবে গুটিয়ে তার শরীরের পাশ বরাবর পাশবালিশের মতন করে সরিয়ে রাখছেন। ললিতের দেহে কোন জীবনের সাড়া নেই। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো সুরভির। তবে কি শিকড়ে কোন কাজ হল না! শেষ আশাতেও পড়লো ছাই!

"একি হল গো সাধুবাবা, তবে কি আমার ভাঙা কপাল জুড়বে না?"

সন্ন্যাসী নিজের ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে সুরভিকে নীরব থাক তে ইসারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেল সুরভি।

পুরোহিতকে ডেকে সন্ন্যাসী বললেন, "একটু গঙ্গাজল নিয়ে আসুন কমণ্ডলু করে।"

কমণ্ডলু করে গঙ্গাজল নিয়ে আসতে সন্ন্যাসী সেই জল ছিটিয়ে দেন ঘরের চারদিকে। বিশেষ করে ললিতের দেহের উপর ঝরতে থাকে গঙ্গাজলের বৃষ্টিধারা। ক্ষতের উপরে ছিটোনো হয় আজলা আজলা গঙ্গাজল। রক্ত ধুয়ে যেতে থাকে।

এর পর সন্ন্যাসী মৃতসঞ্জীবনী মূলটা কমণ্ডলুর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মন্ত্র পড়ে কিছুক্ষণ ঘাঁটেন কমণ্ডলুর ভেতরটা একাগাছা কুশ দিয়ে। এই প্রক্রিয়া শেষ করে সাধুবাবা তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আঁচলের কিছু অংশ কমণ্ডলুর জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেই ভেজা আঁচলের কোণা দিয়ে গলার ক্ষতটা আস্তে আস্তে মুছতে থাকেন। ধীরে ধীরে জমাটধরা রক্তের দলা ধুয়ে ধুয়ে পাতলা হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে সাধুবাবার মন্ত্র চলতে থাকে।

জানালার ভেতর দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে সুরভি আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে দেখে চলে সাধুবাবার ক্রিয়া-কলাপ। তার মুখে কথা নেই। ফেলার মত জলও বুঝি আর নেই চোখে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক বিস্ময়ের চমক লাগে সুরভির চোখে: ভেজা গেরুয়া কাপড়ের ঘষায় ঘষায় গলার উপরকার ক্ষতের জমাটরক্ত আর কাটা মাংস মুছে যেতে যেতে ক্ষতের চিহ্নটাও যেন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল সাধুবাবার যোগ মহিমায়! সুরভির হৃদপিণ্ডটা যেন একবার লাফিয়ে উঠলো আশা-পূরণের আনন্দে। পর মুহূর্তেই চুপসে যায় তার সব আশা। কই, জীবনের কোন সাড়াই তো নেই ললিতের দেহে। আগেরই মত নিষ্পন্দ কাঠ হয়ে পড়ে আছে সে—বুক নড়ছে না, মুখ নড়ছে না। পড়ছে না নিশ্বাস-প্রশ্বাস! পড়ে আছে চোখবোজা অসাড় এক মড়া।

শোকে-পাথর বুকে দাঁড়িয়ে থাকে সুরভি। সময় চলে যায়

আপন গতিতে। হঠাৎ পুরোহিতের কথায় চমক ভাঙে তার—"সাধুবাবা, দেখুন তো লক্ষ্য করে, আমার যেন মনে হয় একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে ললিতের।"

সন্ন্যাসী মৃতসঞ্জীবনীর শিকড়টা নিয়ে ধরেন ললিতের নাকের উপরে। হঠাৎ হেঁচকি তোলার মত একটা শব্দ হয়। তারপর দু'তিন বার ঘন ঘন শ্বাস টানার শব্দ হবার পর নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ শুরু হয়ে যায়।

"জয় মা মহাকালী, তোর জয় হোক মা।"—পরম উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে ওঠেন পুরোহিত মশাই। সাধুবাবা তার গায়ের গেরুয়া চাদরখানা মাদুরের মত মুড়িয়ে ভালো করে গুছিয়ে রাখেন পড়ে থাকা ললিতের শরীরের ওপাশটাতে।

সময় কাটে। আরো সুস্থতার ভাব ফুটে ওঠে ললিতের শরীরে। জানালার বাইরে থেকে দেখে খুশির রেশ লাগে সুরভির মনে। তার চোখকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারে না। অপলকে চেয়ে থাকে সে চোখবোজা ললিতের মুখের দিকে। হঠাৎ সে দেখে ললিতের বোজা চোখের পাতা একটু একটু যেন কাঁপছে। ধীরে ধীরে কাঁপুনী বাড়ে। কাঁপুনী বাড়তে বাড়তে চোখের পাতা একটু একটু করে ফাঁক হয়। অবশেষে চোখ খোলে ললিত। সুরভি এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ললিতের বোজা চোখের দিকে। ললিত চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সুরভির চোখে পড়লো তার দৃষ্টি। এক মোহময়ী, খুশিমাখা স্নিগ্ধ চাহনি উপহার দিয়ে সুরভি স্বাগত জানালো তাকে। এ চাহনি বহুদিন দেখে নি ললিত। তার মন ভরে উঠলো সোমনাথের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায়।

সন্ন্যাসীর ডাকে এবার সুরভি এসে ঢুকলো ঘরে। ঘরে ঢুকেই লুটিয়ে পড়লো ললিতের পায়ে। পায়ে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে সে বলতে থাকলো—"হ্যাঁ গা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আর কখনো তোমার মনে কষ্ট দেব না। তোমার অবাধ্য হব না। তোমার সঙ্গে

বা আর কারও সঙ্গে কখনো ঝগড়া করবো না। মা মহাকালীর নামে আমি শপথ করেছি। হ্যাঁ গা, তুমি আমায় ক্ষমা করলে তো? বলো, ক্ষমা করলে, তা না হলে আমি তোমার পায়ের কাছে মেঝেতে মাথা খুঁড়ে মরবো।"

ললিতের চোখে মুখে ফুটে উঠলো মায়া আর করুণামাখা এক অভূতপূর্ব হাসি। ধীরে ধীরে উঠে বসে সে সুরভির মাথায় সোহাগ ভরে আলতো ভাবে হাত বুলোতে থাকলো।

সন্ন্যাসী ললিতের দিকে তাকিয়ে বললো, "কি গো বাছা, এবার ধীরে ধীরে বাড়ি যেতে পারবে, স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে?"

ললিত মাথা নেড়ে সায় দিল। সুরভি ললিতকে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। ললিতের শরীর তখনো বেশ দুর্বল। বেসামাল ভাবে একটু যেন টলতে টলতে চলছিল সে। তার দুই হাত ছিল সুরভির দুই কাঁধে। সুরভি ললিতকে জাপ্টে ধরে রেখেছিল অতি সাবধানে।

যাবার সময় পুরোহিত সুরভিকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "দেখ মা, এসব দৈব ব্যাপার। এই ঘটনার বিন্দু বিসর্গও যেন কারো কানে না যায়। লোক জানাজানি হলেই কিন্তু সর্বনাশ। এমন কি তোমার ছেলেমেয়েকেও জানাবে না।"

নম্রভাবে মাথা নেড়ে সুরভি বললো "আজ্ঞে হ্যা"।

চলতে চলতে ওরা নজরের বাইরে যাবার পর সন্ন্যাসী আর পুরোহিতঠাকুর গিয়ে ঢোকে মন্দিরের পেছনে, পুরুতঠাকুরের খাস কামরায়। কামরার সব দরজা-জানালা সাবধানে বন্ধ করে দিয়ে সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে খুলে ফেলে তার পরচুল আর নকল দাড়ি। ছদ্মবেশ খুলে নিতেই বোঝা গেল সন্ন্যাসী ঠাকুরটি আসলে ছিল ছদ্মবেশধারী সোমনাথ। দাড়ি-চুল গুটিয়ে পোটলা বাঁধতে বাঁধতে সোমনাথ বললো—"যা কুট কুট করছিল কী বলবো। এখন বাঁচলাম, বাবা। খুব কষ্ট হয়েছে?"

"তা একটু কষ্ট করতে তো হবেই। বিনা কষ্টে কি আর কোন

সৎ কাজ করা যায়। তা ভাই, যা বলো সবারই অভিনয় কিন্তু হয়েছে সম্পূর্ণ নিখুঁত। ললিতের বউ বেচারী কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে নি আমাদের এই ব্যাপার-স্যাপারের।" বললো পুরোহিত ঠাকুর, "আর হ্যাঁ, গলার আওয়াজটা যা বদল করেছিলে না তা একেবারে অবিশ্বাস্য।"

"স্বামীর প্রতি বিরূপ হলে কি হবে সুরভির ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি কিন্তু খুব অটল। ধরে নেওয়া যেতে পারে, জীবনে আর কখনো কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না ও। ললিতকে ও রাখবে খুব তোয়াজে, সুখে-শান্তিতে।" আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বলে সোমনাথ।

"সবই তো বুঝলাম ভাই সোমনাথ, কিন্তু তোমার ঐ গলা কাটা, ললিতের মরে যাওয়া আর বেঁচে ওঠার ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝলাম না। তুমি তো ভাই, আমাকে যেমন যেমন বলতে আর করতে বলেছিলে ঠিক ঠিক তাই তাই করে গেলাম আর বলে গেলাম নির্ভুল ভাবে। কাণ্ডকারখানা দেখে তো আমারও মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়। ব্যাপারটা আসলে কী?"

"এ এমন কিছু নয়, সবই আমার ম্যাজিকের চালাকি। এই তো মাত্র সাত দিন আগে বানিয়েছি এই গলা কাটার ম্যাজিকটা। এ তল্লাটে এই নতুন ম্যাজিকটা আর কখনো দেখানো চলবে না বন্ধু ললিতের মুখ চেয়ে। যাক গে ক্ষতি নেই তাতে। বেচারী সুখে থাক।"

"কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না ভাই সোমনাথ, খুলে বল সব কিছু তাড়াতাড়ি।"

পুরোহিতের কথা শেষ হতে সোমনাথ পুরোহিতের চোখের সামনে মেঝের ওপরে খুলে ফেলে এতক্ষণ তার হাতে গায়ের চাদর মোড়ানো যে পুঁটুলীটা ছিল সেটা। ভেতর থেকে বের হয় একই আকারের ও প্রকারের দুটো রামদা। এই রকম রাম দা-ই বসানো

ছিল ললিতের গলাতে। দুটো রামদার মধ্যে একটা স্বাভাবিক ধরনের। অন্যটার ফলার ধারালো দিকে মাঝ বরাবর ধারের থেকে কিছুটা অংশ আধখানা চাঁদের মতন করে কেটে বাদ দেওয়া। এই রামদাখানা হাতে তুলে নিয়ে সোমনাথ সেটা নিজের গলার সামনে ধরে বলে—"এই রামদাখানার দৌলতেই কার্য সিদ্ধি হয়েছে। আমার গলার মাপ আর ললিতের গলার মাপ প্রায় সমান সমান। দেখুন এবার মজা। আমি আমার গলাটা গলিয়ে দিচ্ছি এই রামদার ধারের কাটা খাঁজে।"

কথা বলতে বলতে সোমনাথ সন্তর্পণে হাতের রামদাটা নিজের গলায় লাগায়। গলার সঙ্গে খাঁজে খাঁজে বসে যায় সেই খাঁজ কাটা রামদা। সোমনাথ মাটিতে শুয়ে পড়ে সাবধানে নিজের হাত সরিয়ে নেয় রামদা থেকে রামদার খাঁজ গলায় খাপে খাপে লেগে রামদাটাকে গলায় বসিয়ে রাখে। দেখে পুরোহিত ঠাকুরের মনে হয় যেন একটা সাধারণ রামদা সোমনাথের গলার অর্ধেকের বেশী অংশ কেটে দু ভাগ করে মাংস-হাড় ভেদ করে বসে গেছে।

"কেমন দেখছেন পুরুত মশাই? এই যে অংশটায় রামদা আটকে আছে সেখানে এখন যদি কিছুটা গোলা লাল রং রান্না করা ঘন বালির সঙ্গে মিশিয়ে লাগিয়ে দিই তবে কী হয়?"—বলে সোমনাথ।

"সে এক বিভৎস দৃশ্য হবে। মনে হবে যেন গলা কেটে ধারালো রামদাটা বেমালুম বসে গেছে। পাশ দিয়ে ফুলে উঠেছে কাটা চামড়া আর মাংশপেশী রক্তে মাখামাখি হয়ে। ঘন রক্তের ধারা বইছে। যেমনটি দেখেছিলাম ললিতের বেলায়।"—বিস্ময়ে বিমূঢ় গলায় বলেন পুরোহিত ঠাকুর। "তা না হয় হল। কিন্তু যখন রামদা টেনে খুলে আনলে তখন তো সেটাতে এমনি ধারা আধখানা চাঁদের মত খাঁজ কাটা ছিল না।"

"সে তো বটেই। যখন ললিতকে প্রথম মা কালীর মূর্তির

সামনে শোয়ালাম তখন তার পিঠের তলায় এক ধারে রেখে দিয়েছিলাম এই ছু নম্বর রামদাটা।”—কথা বলতে বলতে সোমনাথ হাতেনেয় অন্য রামদাটা। “তারপর চাদর চাপা দিয়ে, চাদরের
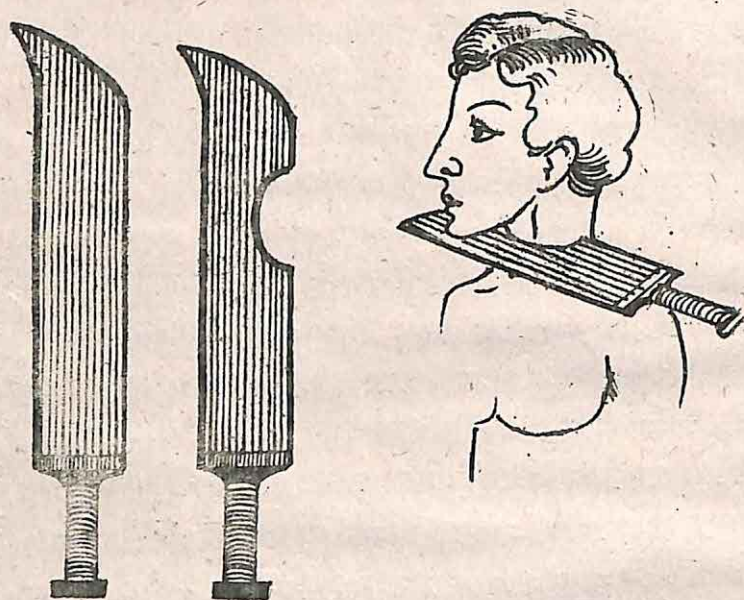
তলায় মন্ত্র পড়ে হাত বোলানোর সময়, ললিতের গলা থেকে এই কায়দাকরা এক নম্বর রামদাটা সরিয়ে নিয়ে রেখেছিলাম ললিতের অন্য পাশে চাদরের ঢাকার তলায়। এই সময়েই কৌশলে এক ফাঁকে ললিতের পিঠের তলা থেকে বের করে এনেছিলাম এই ছু নম্বর মামুলি রামদাখানা। এটাতেও আগে থেকেই একটু নকল রক্ত অর্থাৎ ঘন বার্লি মেশানো লাল রঙ মাখানো ছিল। তাই তো ললিতের বউ আঁৎকে উঠেছিল তা দেখে।”

“মন্দিরের ভেতরে জ্বলছিল মাত্র ছুটো টিমটিমে তেলের প্রদীপ। তাই তো এই ব্যাপার-স্যাপার আরো বেশী রহস্যময় হয়ে উঠেছিল সুরভির কাছে। সামান্য খুঁতও তাই ধরা পড়েনি তার চোখে। কী বল ?”—বলেন পুরোহিত ঠাকুর।

“ঠিক তা নয়। ম্যাজিক হিসাবে দর্শকদের সামনে দেখাবার

সময় কাজটা করা হবে আরো একটু সাবধানতার সঙ্গে। রামদার খাঁজ কাটা ব্যাপারটা করা হবে বেশ যত্নের সঙ্গে। যার গলা কাটার ম্যাজিক করা হবে তার গলার মাপের চেয়ে সামান্য দুই এক চুল ছোট করে কাটা হবে এই আধখানা চাঁদের আকারের খাঁজখানা। এর ফলে গলার চামড়া রামদার খাঁজের ধার থেকে একটু ফুলে বেরিয়ে থাকবে। তার উপরে লাল রঙ করা ঘন বার্লির আস্তর থাকায় কাটার ব্যাপারটা আরো বেশী বিশ্বাসযোগ্য আর বাস্তব বলে বোধ হবে। বাতির জোর বেশী হলেও তাই তখন কোন ক্ষতি হবে না ও ব্যাপারটা দর্শকদের সুতীক্ষ্ণ নজরকেও ফাঁকি দিতে পারবে অতি সহজে।”

“এখানে না হয় দর্শক ছিল এক মাত্র সুরভি। শোকবিহ্বল অনুশোচনায় জর্জর। যেখানে ম্যাজিক দেখাবে সেখানে তো আর দর্শকেরা তেমন থাকবে না। তারা তো সব সময় তক্কে তক্কে থাকবে রহস্য ভেদ করার ফিকিরে। সেখানে কি কার্যসিদ্ধি এত সহজ ভাবে হবে?”

“পুরোহিত মশাই, কোন অসুবিধা নেই। চাদরের তলায় রামদা পাল্টানোর কাজটা ভাল করে আয়ত্ব করে নিতে হবে ভাল ভাবে মহড়া দিয়ে। চাদরের এক ধারে, যে দিকটা থাকবে পেছনের দিকে, সেখানে একটা গোপন পকেটে এই কৌশল করা ১নং রামদাটা লুকিয়ে রাখতে হবে। ললিতকে নিয়ে তার বৌ যখন চলে গেল তখন জড়ানো চাদর তুলে নেবার সময় সেই চাদরের ভাঁজে এমন কৌশলে আমি এক নম্বর রামদাটা উঠিয়ে নিলাম যে আপনিও টের পেলেন না। সবই তো ঠিক আছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে মনটা বড় খচ খচ করছে। মন্দিরে বসে এমন ভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া কি ঠিক হয়েছে? এ মিথ্যাচার কি সইবেন মা মহাকালী?”—সংশয় প্রকাশ করে সোমনাথ পুরোহিত ঠাকুরের কাছে।

"নিশ্চয়ই সইবেন। মা আমার অন্তর্যামী। সব কিছু জানেন তিনি। তিনি কি জানেন না ললিতের মনের ব্যথার কথা! তিনি কি জানেন না, কোন অসহ্য দুঃখের জ্বালায় কষ্ট পেয়েছে ললিত দিন-রাত, সপ্তাহ, মাস, বছর! তিনি কি জানেন না কি দুঃসহ কলহ-জ্বালায় এত দিন দুঃখ পেয়েছে ললিতের প্রতিবেশীর দল! মা মহাকালীর অজানা কিছুই নেই। আজ না হয় কাল। এক দিন না এক দিন বৌ-এর জ্বালায় ললিতকে আত্মঘাতী হতেই হত। ললিত মরে গেলে সুরভি যে সুখি হত তা নয়। অপার দুঃখের সাগরে ভাসতো সে। তার মেজাজ হত আরো খিটখিটে। প্রতিবেশীদের আরো বেশী করে জ্বালাতো সে। তার ছেলেমেয়ে পড়তো সীমাহীন দুঃখে। মানুষ হত না তারা। হয় তো বা না খেতে পেয়ে বেঘোরে মারা পড়তো নিরপরাধ বেচারীরা। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমরা প্রতারণা করিনি কাউকে। কোন ক্ষতি করিনি কারও, কোন ভাবে। শুধু মাত্র সুরভির ধর্ম বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে আমরা তাকে পতি-ভক্তি আর পতি-প্রেমের পথে ফিরিয়ে এনেছি। এর জন্য যদি সামান্য কিছু মিথ্যাচার আমরা করে থাকি সে জন্য কার্য-কারণ ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে মা মহাকালী আমাদের অবশ্য অবশ্য ক্ষমা করবেন। আমরা আত্মহত্যাকামী ললিতের মন বদলিয়েছি। পতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছি তার স্ত্রী-পুত্র কন্যাসহ গোটা পরিবারকে। মা মহাকালী রুষ্ট না হয়ে বরং তুষ্টই হবেন আমাদের প্রতি এই সৎকাজের জন্য। তবুও যদি সংশয় থাকে তবে এসো, আমরা মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি সেজন্য। মার কাছে প্রার্থনা করি এসো। "মা মহাকালী, ললিতকে, তার পরিবারকে সুখি করুন। তাদের শান্তি দিন। তাদের ভাল করুন।"—কথা শেষ করে সোমনাথকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পুরোহিত ঠাকুর গিয়ে হাজির হন মা

মহাকালীর মূর্তির সামনে। কায়-মনবাক্যে দু জনে মায়ের কাছে জানায় প্রার্থনা।

এর পর কেটে গেছে বহু দিন। সবাই অবাক হয়ে দেখেছেন ললিতের সংসারের অদ্ভুত পরিবর্তন। সুরভির স্বভাবের রাতারাতি পরিবর্তন দেখে সবাই অবাক। সে তার স্বভাব পাল্টে ফেলেছে। হাসিমুখে সে কথা বলে সবার সঙ্গে। কারো সঙ্গে আর ঝগড়া হয় না তার। কেউ কোন কটু কথা বললে, সে উত্তর দেয় হাসি মুখে শান্ত মিষ্টিস্বরে। ললিতকে শ্রদ্ধা করে। ভক্তি করে ভালবাসে। তার সেবা-যত্নে ললিতের শরীরে খেলছে লালিত্যের চেকনাই। খুব সুখে আর শান্তিতে কাটছে তার দিন। এ সবের জন্য সে কৃতজ্ঞ তার বন্ধু সোমনাথের কাছে। মা মহাকালীর নাম সর্বদা তার মুখে। বাড়িতে মা মহাকালীর মূর্তি স্থাপন করেছে সে। বছরে একবার শ্যামাপূজার দিন ধূমধাম করে সে করে মা মহাকালীর বিশেষ বার্ষিক পূজা। সুরভি জানে মহাকালীর কৃপাতেই সে ফিরে পেয়েছে স্বামীর জীবন। অনেক খোঁজ খবর করেছে সুরভি কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের অধিকারী, মৃতসঞ্জীবনী গাছের শিকড়ধারী সেই সাধুবাবার সন্ধান সে আর পায়নি। এখনো খোঁজ করছে সে। সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে পেলে সে তাঁকে গড়িয়ে দেবে রূপোর চিমটে আর রূপোর কমণ্ডলু। মহাকালীর মন্দিরের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু হাসেন। জোর-জারি করলে বলেন—"মা, ওরা সব সর্বত্যাগী সাধু-মহাত্মা। লোকালয়ে কি আর যখন তখন আসেন ওঁরা। তোমার সিঁদুরের জোর আছে তাই সে দিন তাঁর মহা-আবির্ভাব ঘটেছিল ললিত ঠাকুরের প্রাণ বাঁচাতে। এ সব ব্যাপার নিয়ে আর উচ্চ-বাচ্য কোরো না। যা প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাও। তোমার মঙ্গল হবে তোমার পরিবারের মঙ্গল হবে। যেখানেই থাকুন তিনি, সেখান থেকেই তিনি আশীর্বাদ করবেন তোমাদের।"

চম্বলের দস্যুরাজ

চম্বল নামটা। বড় মিষ্টি। তবুও এই নাম শুনে সবার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। আঁতকে আঁতকে ওঠে সবার মন। বনে-পাহাড়ে, গুহা-কন্দরে যত নির্মম-নিষ্ঠুর, রক্ত-পিপাসু দস্যু-ডাকাতের আস্তানা। সুযোগ পেলেই যখন তখন নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর চালায় এরা অত্যাচার। খুন-জখম, ডাকাতি-লুণ্ঠন, নর-নারী হরণ আর গৃহদাহ এদের নিত্যদিনের বিলাস-ব্যসন।

এই সব দস্যুদের প্রধান দস্যুরাজ সংগ্রাম সিং। তার নাম শুনে কোলের শিশুরাও বুঝি কান্না ভুলে চুপ করে থাকে। তার সঙ্গী-সাথীরাও তারই মতন নির্দয় আর খুন-পাগল। ঝড়ের বেগে ছুটে চলে তারা ঘোড়সওয়ার হয়ে। দুহাতে নির্ভুল নিশানায় চালায় হাতের বন্দুক। হাসতে হাসতে লোকের গলায় বসিয়ে দেয় ছুরি। পুলিশের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেয়। বেকায়দা

দেখলে হাওয়ায় মিশে আশ্রয় নেয় গভীর বনে, বেহরে, পাহাড়ের গুহায় আর পাহাড়ের আড়ালে-আড়ালে। পুলিশের শত চেষ্টাতেও খুঁজে বের করতে পারে না তাদের।

অবস্থা শান্ত হয়ে এলেই আবার তারা শুরু করে তাদের হত্যালীলা আর ডাকাতি। এমনি করেই কাটে তাদের নিষ্ঠুরতার জীবন। সংগ্রাম সিং সবার ত্রাস। তার দলের লোকেরাও যমের মত ভয় করে তাকে। তার কোপ-দৃষ্টিতে পড়লে কারো নিস্তার নেই। তার কথার অবাধ্য হলে বা দলের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন কাজ করলে তার মৃত্যু অবধারিত। আর সে মৃত্যুও এক অদ্ভুত ধরনের। একটা তলোয়ারের ডগায় তীব্র বিষ মাখিয়ে সেই তীক্ষ্ণ তলোয়ারের ডগাটা প্রথমে ঠেকানো হয় যাকে শাস্তি দেওয়া হবে তার নাভির কাছে। এর পর প্রচণ্ড চাপে সেই বিষ-মাখা তলোয়ার দণ্ড-ভোগীর পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে পিঠের দিকে। অসহ্য যন্ত্রণায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় সাজা ভোগকারীর।

দস্যুরাজ সংগ্রাম সিং-এর আস্তানা ছিল গভীর বনের মাঝামাঝি। এর এক ধারে ছিল পাহাড়। এই পাহাড়েরই মাঝখানে এক বিরাট গুহা। সেই গুহায় ছিল দস্যুরাজ সংগ্রাম সিং-এর রাজসিংহাসন। এইখানে বসেই সংগ্রাম সিং তার নানা অসৎ পরিকল্পনা রচনা করতো আর ভাগ-বাটোয়ারা করতো যত লুটের মাল-পত্তর।

ডাকাত হবার আগে সংগ্রাম সিং ছিল ভারতীয় সৈন্যবিভাগের একজন সাহসী জওয়ান। যুদ্ধবিদ্যায় ওস্তাদ এক পদাতিক বন্দুকধারী সিপাহী। সীমান্তে কাজ করার সময় তার কাছে গিয়ে পৌঁছালো এক মর্মান্তিক তুসংবাদ। তার বাড়ি-ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছুটি নিয়ে ছুটে এলো সে নিজের গাঁয়ে। বৌ আর ছোটছেলের আগুনে পোড়া বিকৃত মৃতদেহ দেখে শোকে তুঃখে সে

হয়ে উঠলো বেপরোয়া। তার বড়ছেলে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। সে তখন ছিল তার মামার বাড়িতে।

কেমন করে ঘটলো এই অঘটন। এই সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ড? নানা ভাবে খোঁজ নেয় সে গোপনে গোপনে। রহস্য ভেদ হতে দেরি হয় না। সঠিক খবর আসে তার কানে নানা সূত্র থেকে। গাঁয়ের জোতদার পুরুষোত্তম পাণ্ডেই পুরানো আক্রোশের জের ধরে করেছে এই পৈশাচিক কুকর্ম। পুরুষোত্তমই লোকজন দিয়ে তার বাড়িতে আগুন ধরিয়েছে গভীর রাতে। পুড়িয়ে মেরেছে তার আদরের বৌ আর কোলের ছেলেকে! রাগে অগ্নিশর্মা হয় সংগ্রাম। তখনই সে ছুটে যায় পুরুষোত্তমের বাড়ি। সে তখন তার ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে রসিয়ে রসিয়ে সংগ্রামের ঘর জ্বালানোর গল্প করে বাহাদুরী নিচ্ছে। আড়াল থেকে এ কথা শুনে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না সংগ্রাম। সামনে পড়েছিল একটা বড় চ্যালা কাঠ। সেইটা হাতে নিয়ে সে গিয়ে দাঁড়ায় পুরুষোত্তমের সামনে। ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে যায় পুরুষোত্তম।

"তুমি আমার ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ আমার বৌ-ছেলেকে। কেন? কেন?"

কিছু একটা বলতে যায় পুরুষোত্তম। কথা শুরু করার আগেই তার মাথার উপরে বজ্রের মত আছড়ে পড়ে সংগ্রামের হাতের ভারি চেলা কাঠ। বিভৎস ভাবে থেৎলে যায় পুরুষোত্তমের মাথা। তার প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ে খাটিয়ার উপরে।

ক্ষণিকের জন্যও সংগ্রাম দাঁড়ায় না সেখানে। প্রাণপণ বেগে ছুটে পালায় সংগ্রাম অকুস্থল থেকে! সে আইন নিজের হাতে নিয়েছে। করেছে দারুণ অপরাধ। এবার পালানো ছাড়া আর কোন পথ নেই। গা ঢাকা দেয় সংগ্রাম সিং। সেনা বিভাগের বিশ্বস্ত জওয়ান, সংগ্রাম সিং। চম্বলের বদনামী বেহর হয় তার আশ্রয়। তাকে নানাভাবে, নানা সম্ভব, অসম্ভব জায়গায় খোঁজে

পুলিশ। অসফল হয়ে পুরস্কার ঘোষণাসহ হুলিয়া বের করে। লোকালয়ে বেরিয়ে আসার আর কোন উপায় থাকে না সংগ্রাম সিং-এর।

অনাহারে অনিদ্রায় বেহরের মধ্যে কাটলো তার কয়েকটা দিন। অবশেষে একদিন সে পড়লো দস্যু দলপতি শঙ্করের লোকজনের হাতে। দস্যুরা তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো দলপতির সামনে। পুলিশের ছাপানো হুলিয়া দস্যু সর্দার শঙ্করের চোখে পড়েছিল। সংগ্রাম সিং-কে দেখেই সে তাই চিনতে পারলো।

"কী হে স্যাঙ্গাৎ, আর তো কোন পথ খোলা নেই। জলজ্যান্ত খুনের মামলার আসামী তুমি। কোথায় আর যাবে? বাইরে গেলেই তো পড়বে পুলিশ বেটাদের হাতে। ঝুলবে ফাঁসীর দড়িতে। তার চেয়ে বরং আমার দলে ভিড়ে যাও। আমার নাম জানো তো? আমি দস্যুরাজ শঙ্কর। খাওয়া-পরার অভাব হবে না। লুটের মালের ভাগ পাবে। তা ছাড়া তুমি তো আবার ওস্তাদ মিলিটারী জওয়ান। ভাল কাজ দেখাতে পারলে উন্নতিও করতে পারবে।"

উপায়ান্তর না দেখে সংগ্রাম সিং নাম লেখায় শঙ্করের দস্যু দলে। অল্পদিনের মধ্যেই তার সেনা বিভাগের অভিজ্ঞতার গুণে সে হয়ে ওঠে শংকরের দস্যু দলের প্রথম সারির একজন। এর মধ্যেই একবার হয়ে গেল পুলিশের সঙ্গে এক ভয়ানক সামনা-সামনি লড়াই। এই লড়াইয়ে সংগ্রাম সিং দলের রাইফেলধারীদের বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিচালনা করে গুলি চালালো। পুলিশ পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো। এই দিন থেকে সে হয়ে উঠলো দস্যুরাজ শঙ্করের ডানহাত। তার মতামতের উপর অনেকটা নির্ভর করে শঙ্করের সব পরিকল্পনা আর দল-পরিচালনার ব্যাপার।

পুলিশের সঙ্গে এক মুখোমুখি লড়াইয়ে মারা গেল দস্যুরাজ

শঙ্কর। দলের সবাই একমত হয়ে এবার সংগ্রাম সিং-কে করলো দলের নেতা। ততদিনে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে দশ দিকে। এবার সে হল দস্যুরাজ সংগ্রাম সিং। সর্দার হয়েই সংগ্রাম তার দলের নিয়মকানুন নতুন করে বেঁধে নিলো আরো কড়াকড়ি ভাবে। পুরোপুরি সৈন্য বিভাগের কায়দায় সাজিয়ে নিল দলকে। ফৌজি কায়দা কৌশলে পাকা-পোক্ত করে তুললো দলের প্রতিটি লোককে বন্দুক আর অন্যান্য অস্ত্র চালনায়। এমনি করেই সে তার দলকে করে তুললো চম্বলের সেরা দস্যুদল। সংগ্রাম সিং হয়ে উঠলো চম্বলের দস্যুরাজ।

আদর-যত্নে মামার বাড়িতে মানুষ হয়ে উঠছে সংগ্রাম সিং-এর একমাত্র জীবিত বংশধর। তার বড় ছেলে অমর সিং। প্রায়ই তার কথা মনে পড়ে সংগ্রাম সিং-এর। হঠাৎ কী খেয়াল হতে একদিন গভীর রাতে সংগ্রাম সিং গিয়ে হাজির হল তার শ্বশুর বাড়িতে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলো সংগ্রাম। মামা-মামী, দাদু-দিদিমা কারো মনে ধরলো না এ প্রস্তাব। তবুও ভয়ে তারা রাজী হল দস্যুরাজের প্রস্তাবে। তার চেনা পরিবেশ ছেড়ে, কিশোর অমর বাধ্য হল তার বাবার সঙ্গে যেতে।

এমনিভাবেই কিশোর অমর সিং এসে ভিড়লো ডাকাতের আড্ডায়, তার স্বাভাবিক, শান্তিময় পল্লীজীবন বিসর্জন দিয়ে। তাকে দেওয়া হতে থাকলো ডাকাত হয়ে ওঠার উপযুক্ত সব শিক্ষা। যত্নের সঙ্গে তার বাবা নিজের হাতে সব বিষয়ে শিক্ষা দেয়। অমর সিং নিষ্ঠার সঙ্গে অতি যত্নে শেখে সে সব। খুশি হয় সংগ্রাম সিং পুত্রের সাফল্যে। গর্ববোধ করে সে। হ্যাঁ, তার ছেলে দস্যুরাজ হিসাবে তার নাম রাখতে পারবে।

অমর সিং-এর কিন্তু আসলে এ সব ভাল লাগে না মোটেই। তার মন এক ভিন্ন বস্তুতে গড়া। নির্মমতা, নৃশংসতার লেশমাত্র নেই তার চরিত্রে। বন্দুকের নিশানায় ওস্তাদ হয়ে উঠলো সে

অল্পদিনের মধ্যে। তার নিশানায় খুঁৎ থাকে না। গুলি ছুঁড়ে দূর থেকে গাছের ডগার ফলের বোঁটা কেটে ফল নামায় সে। কোনবারই নিশানা ফসকায় না। কোন প্রাণী বা পাখিকে নিশানা করতে গেলেই তার গুলি বিপথে যায়। মানুষের গায়ে গুলি মারার কথা সে ভাবতেই পারে না।

ডাকাতি করার সময় দুবার সংগ্রাম সিং সঙ্গে নিয়ে যায় অমর সিং-কে। বার কতক সংগ্রাম সিং অমরসিং-কে মানুষ-জনের দিকে গুলি করতে বলে। অমর সিং গুলি চালায়। কারো গায়ে লাগে না সে গুলি। লক্ষ্য পেরিয়ে উপর দিয়ে পার হয়ে যায়। গুলি খরচা হয় লোক মরে না। একটু অবাক হয় সংগ্রাম সিং।

একবার একদল পুলিশ এসে ছাউনি ফেললো জঙ্গলে। উদ্দেশ্য—সংগ্রাম সিং-এর দলবলকে ধরা। একটু যেন বেকায়দায় পড়ে সংগ্রাম সিং। পুলিশদলকে জব্দ করার জন্য সংগ্রাম সিং তার ছেলের সঙ্গে একদল সাহসী ডাকাত পাঠালো। আড়ালে থেকে প্রথমে তার দলবল নিয়ে অমর সিং লক্ষ্য করলো পুলিশ দলের গতিবিধি। তারপর পুলিশদল যেই না একটু অসতর্ক হল অমনি তার দল ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশদলের উপর। পুলিশদলের অনেক লোক মারা পড়লো ডাকাতের গুলিতে। ডাকাত মরলো মাত্র দুজন। পুলিশদলের নেতা ছিলেন একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার। তিনি ধরা পড়লেন ডাকাত দলের হাতে।

"চলুন ছোটকর্তা, এই বেটা পুলিশ শয়তানকে বেঁধে নিয়ে যাই। এটাকে হাতে পেলে সর্দার খুব খুশি হবে। অনেক কাজে আসবে এই বেটা।"—অমর সিং-এর এক ডাকাত-সঙ্গী প্রস্তাব করে।

"না ভাই শত্রুর শেষ রাখতে নেই। দেরি করলে কোথা থেকে কোন বিপদ এসে পড়বে কে জানে। শুভস্য শীঘ্রম্। এখনই এ মক্কেলকে খতম করতে হবে। বাবার জন্য জিইয়ে রেখে

কোন দরকার নেই। নিজের হাতেই আমি কোতল করবো এই শয়তানকে।" পিছমোড়া করে হাত বাঁধা পুলিশ অফিসারকে কোমরের বেল্ট ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে অমর সিং। একটা ছোট খাড়ির মধ্যে বন্দীকে টেনে নিয়ে ঢোকে অমর। নিজেকে মুক্ত করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেন অফিসার।

"আপনাকে মারতে নিয়ে যাচ্ছি না আমি। রক্তপাত আমার ছুচক্ষের বিষ। আজ পর্যন্ত আমি কোন মানুষ খুন করিনি।" —ফিসফিস করে বলে অমর সিং।

"তোমার কথাগুলো বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছে। রক্ত-পাগল সংগ্রাম সিং-এর দলের ডাকাত তুমি। আর তুমি বলছ কিনা রক্তপাত তোমার ছু চক্ষের বিষ। আজ অবধি কোন মানুষ খুন করো নি তুমি! একথা কি বিশ্বাস করা যায়?"

"যুক্তিতর্কের কোন সময় নেই মশাই এখন। আমি আপনার মাথার উপর দিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করছি! গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি শেষ চিৎকারের মত এক বুক-ফাটা আর্তনাদ করে উপুড় হয়ে পড়বেন মাটিতে। আমি আমার উরুতে ছোরা বসিয়ে রক্ত বের করে সেই টাটকা রক্ত আপনার গায়ে ছড়িয়ে দেব। আপনি মড়ার মত অসাড়-অনড় হয়ে পড়ে থাকবেন মাটিতে। আমরা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যেতে আপনার কোন কষ্ট হবার কথা নয়। কী বলেন? তবে একটা কথা জেনে রাখুন: অবস্থা গতিকে আমি এখন ডাকাতের দলে। একাজে আমার মনের সায় একটুও নেই। মনে-প্রাণে ঘৃণা করি আমি ডাকাতিকে। উপায় নেই তাই পড়ে আছি।"—কথা শেষ করে অমর তার কোষ থেকে টেনে বের করে এক ধারালো ছোরা। অফিসারের বুকে কাঁপুনী ধরে। ডাকাতের কথায় কী বিশ্বাস। এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। চোখের পলকে অমর নিজের বাঁ উরুতে বসিয়ে দেয় ছোরার ডগা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। এক

ধাক্কায় অমর পুলিশ অফিসারকে উপুড় করে ফেলে মাটিতে। তার পিঠের উপর ঝরে পড়ে অমরের উরুর টাটকা উষ্ণ রক্তধারা।

কাঁধে ঝোলানো বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে এইবার অমর ফাঁকা গুলি চালায়। অন্তিম আর্তনাদ বেরিয়ে আসে ভূতলশায়ী অফিসারের কণ্ঠ থেকে। চারদিক ভাল ভাবে দেখে নিয়ে অমর সিং বেরিয়ে আসে বাইরে। সবাই মিলে এগিয়ে যেতে থাকে ডেরার দিকে। ফেরার আগে সবাই একবার উঁকি মারে খাড়িটার ভেতরে। রক্তাক্ত দেহে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে বেচারী পুলিশ অফিসার। হঠাৎ এক ডাকাতের নজর পড়ে অমরের উরুর দিকে। "রক্ত ঝরছে যে। ব্যাপার কী?"

"আর বোলো না, ভাই। মরবার আগে বেটাচ্ছেলে আমার ছোরাটা টেনে নিয়ে এক ঘা বসিয়েছিল আমার পায়ে।"—যেন কিছু হয় নি এমনি ভঙ্গিতে জবাব দেয় অমর।

"ওস্তাদ, তোমার ছেলে কী কু-কীর্তি আজ করেছে জানো? আজ সকালে দলের লোকেরা প্রাণপণ লড়াই করে যে বেটা পুলিশ অফিসারকে আটক করেছিল, তোমার আদরের ছেলে অমর সিং তাকে ছেড়ে দিয়েছে।"—শান্ত গলায় সংগ্রাম সিং-এর এক গুপ্তচর জানায় সংগ্রাম সিং-কে।

"বাজে কথা বোলো না। অমর নিজের হাতে পুলিশ বেটাকে নিকেশ করেছে। সব শুনেছি আমি। কাজের মত কাজ করেছে অমর।"—গর্বভরে বলে সংগ্রাম সিং।

"কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কী করে সর্দার? লুকিয়ে থেকে যে স্বচক্ষে আমি দেখেছি শ্রীমানের সব কাজ-কারবার। নিজের হাতে নিজের উরুতে ছোরা বসিয়ে সেই রক্ত নিয়ে ছড়ালো পুলিশ বেটার পিঠে-গায়ে। তারপর তার উপর দিয়ে উপর দিকে চালালো বন্দুকের ফাঁকা গুলি। পুলিশ বেটা লোক শোনানো

চিৎকার করে মড়া সেজে পড়ে থাকলো খাড়ির ভেতরে। তারপর যখন সবাই চলে এলো তখন এক ফাঁকে হাঁটা দিল শহরের দিকে। সবই আমার নিজের চোখে দেখা। সর্দার তোমার নুন খেয়েছি। নুনের অপমান করবো না।"—দৃঢ়কণ্ঠে বলে গুপ্তচর।

সঙ্গে সঙ্গে অমরকে ডাকানো হল। দলের যত পুরনো লোক তাদের সবার সামনে সংগ্রাম সিং বিশদভাবে বললো গুপ্তচরের মুখ থেকে শোনা সব কথা। তারপর অমরের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো—"যা শুনেছি তা কি ঠিক?"

"সব সত্যি, বাবা।" মাটির দিকে তাকিয়ে নিঃশঙ্ক কণ্ঠে বলে অমর।

তার উত্তর শুনে হকচকিয়ে গেল সবাই। একি বলছে সে? কারো মুখে রা নেই। বিস্ময়ে মূক হয়ে পড়েছে সকলে।

"এ ডাকাতির জীবন আমার ভাল লাগে না, বাবা। আমাকে তুমি আমার বাড়ি ফিরে যেতে দাও। সেখানে গিয়ে সুখে থাকবো আমি। লক্ষ্মী বাবা, কথা শোন আমার। মানুষ মারা আমাকে দিয়ে কোনদিন হবে না। তুমি তাকে মেরে ফেলবে। একথা নিশ্চিত জেনেও কোন লোককে আমি ধরে এনে তোমার হাতে কি তুলে দিতে পারি আমি? তাই পুলিশ অফিসার মশাইকে ছেড়ে দিয়েছি। যে কাজে আমার মন, আমার বিবেকের সায় নেই সে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"এ বেইমান-বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কী? আপনারা বিচার করে বলুন আমাকে। মনে রাখবেন দলের সবার জন্যে একই আইন—একই সাজা। আমার ছেলে বলে এর রেহাই নেই। দলের অন্য কেউ এই কসুর করলে যে সাজা তাকে আপনারা দিতেন, এর জন্যও সেই একই সাজার ব্যবস্থা করবেন। তার কম নয়।"—ধীর গলায় বললো সংগ্রাম সিং।

ভেবে দেখার জন্য কিছু সময় চাইলো ডাকাতেরা। অমর সিং-কে আটক করে রাখা হলো এক কুঠুরীর মধ্যে।

ডাকাতদের রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করত যে বিশেষ লোক তার নাম যশপাল। অমরের মামার বাড়ির গাঁয়ে ছিল তার বাড়ি। অমরকে সে খুব ভালবাসতো। এই যশপালই অমরের দেখাশোনার কাজ করে আসছিল এই জঙ্গলের রাজ্যে। যশপালের যত্নে-আদরেই সে বেড়ে উঠেছে ডাকাতদের ডেরায় আসার পর। বয়সে অনেক বড় হলে কী হবে, যশপালই ছিল অমর সিং-এর নিত্য দিনের সঙ্গী। সব সময়ের সাথী। অমরের এই অঘটনের কথা শুনে তাই অস্থির হয়ে ওঠে যশপাল। তার মাথায় যেন ভেঙে পড়ে গোটা আকাশটাই।

বিচারে অমর সিং-এর ভাগ্যে কী সাজা জুটবে তা বেশ আন্দাজ করতে পারে যশপাল। চিরাচরিত সেই ডাকাতের সাজা! বিষ মাখানো তলোয়ার পেটের এপারে ফুঁটিয়ে দিয়ে ওপার অবধি পার করা। এই যন্ত্রণাময় মৃত্যুই হবে তার সাজা। এ অপরাধের একমাত্র সাজা যে তাই।

"এমনভাবে অমর সিং-কে মরতে আমি দেব না। উপায়। একটা সঠিক উপায় বের করে বাঁচাতেই হবে অমর সিং-কে। আমি বেঁচে থাকতে, আমার চোখের সামনে অমর সিং-এর মত একটা ফুলের মত নিষ্পাপ জীবন এমনভাবে শেষ হতে আমি দেব না। যেমন করে হোক অমরকে বাঁচাবোই আমি কোন ছলে বলে কৌশলে।" মনে মনে ভাবে যশপাল। সংকল্পে দৃঢ় হয় তার মন। আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে সে। কোন্ ভাবে, কোন্ পথে এগুলে কাজ হবে, কপাল কুঁচকে ভাবে আর ভাবে যশপাল। নিজের জীবন বিপন্ন করেও বাঁচাতে হবে অমরকে।

যশপাল ভাবে আর ভাবে। ভাবতে ভাবতে সে ফিরে যায় তার অতীত জীবনে। কত রং বেরংয়ের সুখ স্মৃতি ভিড় করে আসে

তার মনের আনাচে-কানাচে। হঠাৎ একটি পুরনো কথা মনে হতেই তার মন ঝিলমিলিয়ে ওঠে আশার আলোকে। তার মনে হয় বোধ হয় সে পারবে অমরের জীবন বাঁচাতে। হয়তো সে পেয়ে গেছে সঠিক পথের সন্ধান।

বেশ কয়েক বছর আগে ভিন দেশে সে করেছিল এক আজব ধরনের কাজ। কিছুদিন সে করেছিল একজন যাদুকরের সাগরেদের চাকুরী। এই যাদুকর অন্যান্য অনেক রোমাঞ্চকর খেলার সঙ্গে দেখাতেন এক মজার খেলা। তাঁর সহকারীকে স্টেজের উপরে দাঁড় করিয়ে তিনি তার নাভির কাছে জামার উপরে ঠেকাতেন একটা লম্বা ধারালো তলোয়ার। তারপর এক-দুই-তিন বলে এক মোক্ষম ধাক্কা লাগাতেন তলোয়ারের হাতলে। স্যাৎ করে তলোয়ারটা সহকারীর পেট ভেদ করে চলে যেত। পেছন দিকে পোশাক ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়তো তলোয়ারের ছুঁচোলো ডগার কিছুটা অংশ। এর পর সহকারী দাঁড়াতো দর্শকদের দিকে পাশ দিয়ে। এই অবস্থায় যাদুকর আস্তে আস্তে তলোয়ারের হাতল টানতেন। পেছন দিয়ে বেরিয়ে থাকা তলোয়ারের ডগার অংশ সহকারীর পেটের মধ্যে ঢুকে আসতো। হাতলের দিকটাও বেশ কিছুটা বেরিয়ে আসতো বাইরে। আবার তিনি ঠেলতেন হাতলের দিকটা। তলোয়ারটার পুরো ফলাটা আবার সহকারীর পেট ভেদ করতো। ডগার দিকটা আবার মাথা বের করতো সহকারীর পেছনে পিঠের দিকে। কোন কোন দিন যাদুকর তলোয়ারের ফলাতে রক্ত চুঁইয়ে পড়াও দেখাতেন।

কোন্ কারসাজিতে যে এই ম্যাজিক দেখানো হত যশপালের পুরোপুরি জানা সহকারীর কোমরে কোমরের মাপে যে বাঁকানো খাপ লাগিয়ে এই ম্যাজিক দেখানো হয় সেই বাঁকানো খাপ দিনের পর দিন সে হাতিয়ে দেখেছে। দিনের পর দিন সে সহকারীর

পেটের সঙ্গে এই খাপ বেঁধে দিয়েছে। তার উপরে পোশাক পরিয়ে তাকে প্রস্তুত করে দিয়েছে অনুষ্ঠানের জন্য।
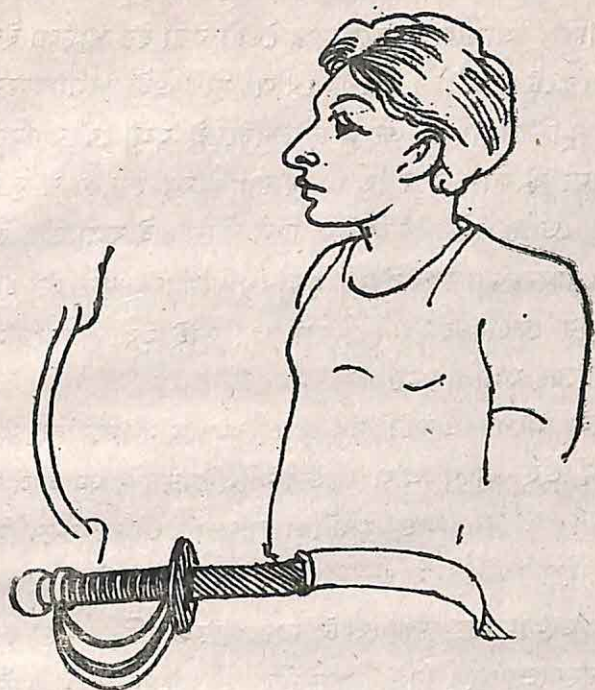
এ খাপ হচ্ছে তলোয়ারের খাপের মতনই একটি জিনিস। টিনের পাত দিয়ে বানানো এই খাপটা চেপ্টা পিঠ এমন মাপে বাঁকানো যাতে এটা কোমরবন্ধের মত সহকারীর কোমরের কাছে নাভি থেকে শিরদাঁড়া অবধি বেষ্টন করে থাকে। শুরুতে আর শেষে এই খাপটা বাইরের দিকে আঙ্গুল খানেক মতন বেঁকে উঁচু হয়ে থাকে। জামার ভাঁজে ঢাকা থাকে এই এক আঙ্গুল উঁচু অংশ। গায়ে পরা থাকে। ঢিলে-ঢালা জামা বাঁকা এই খাপটাকে কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখার জন্য এর দু-প্রান্তে আংটার সঙ্গে লাগানো থাকে ফিতে। এই ফিতে দিয়েই এটাকে বেঁধে রাখা হয় সহকারীর কোমরে।

এ কাজে যে তলোয়ারটা ব্যবহার করা হয় সেটাও হয় বিশেষ

ধরনের। সহজে এই খাপের মধ্যে গলে যেতে পারে এই তলোয়ার। বাঁকানো খাপে কেমন করে ঢুকবে এই সোজা তলোয়ার? আসলে এ তলোয়ার তৈরী করা হয় পাতলা ইস্পাতের চাদর কেটে। বাঁকা খাপের খোলা মুখে এই তলোয়ারের ফলার ডগাটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটু চাপ দিতেই ফলা বেঁকে নিজের পথ করে নেয় বাঁকা খাপের ভিতর দিয়ে। কোমরের পাশ ঘুরে বাঁকা খাপের ভেতর দিয়ে সরাসরি চলে গিয়ে এই ফলা তার ডগা বের করে পেছনের দিকে বাঁকা মুখ পেরিয়ে। দর্শকদের হাতে এই তলোয়ার দেওয়া হয় না। দর্শকেরা তাই বুঝতে পারে না যে এ তলোয়ারের ফলা পাতলা।

এই খাপের একটা মুখ মৌচাকের মোম দিয়ে বন্ধ করে নিয়ে যাদুকর এই খাপে জ্বাল দেওয়া বার্লি মেশানো ঘন লাল রঙ ভরে নিতেন! তারপর অন্য মুখটাও আবছা করে বন্ধ করে নিতেন ঐ মোম দিয়ে। এর ফলে এক মজা হত। নাভির কাছে জামার ফাঁকে তলোয়ারের ডগা ফোটানোর পরেই গড়িয়ে পড়তে থাকতো লাল রক্ত স্রোত (?)। পেছন দিকেও মোমের ছিপি কাটার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়তো রক্ত-ধারা। কাণ্ড দেখে শিউরে উঠতেন যত দর্শক। কেউ কেউ আবার এই বিভৎস দৃশ্য দেখে দুহাতে নিজের চোখ চাপা দিতেন আতঙ্কে।

এই ম্যাজিকের কৌশলটা যদি নিখুঁৎভাবে কাজে লাগানো যায় আর যশপাল যদি তার যাদু-শিক্ষা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে, তবে এবারের মত অমরকে অমর রাখা যেতে পারে।

দুই হাত একত্র করে যশপাল প্রণাম জানায় মা জগদম্বার পায়। তারপর ধীর পায়ে সে গিয়ে হাজির হয় তাদের আস্তানার কামারশালায় গিয়ে। এখানে বসে ডাকাতদের কামার বানায় আর সারাই করে ডাকাতদের যত অস্ত্র-শস্ত্র আর যন্ত্রপাতি।

প্রায়ই চড়ায়বড়ায় বেরয় ডাকাতেরা। আস্তানায় একা থাকে

যশপাল আর কামার। সুখ-দুঃখের গল্প করে তারা। এমনি করেই যশপালের সঙ্গে কামারের হৃদ্যতা একটু বেশী। অতি গোপনে কামারকে দিয়ে যশপাল বানিয়ে নেয় অমরের কোমরের মাপের এক 'ম্যাজিক-খাপ' আর একটা সঠিক মাপের সেই পাতলা তলোয়ার। কামারের কাজ দেখে তো অবাক যশপাল। সে ভাবতেও পারে নি, এত নিখুঁত হবে এই যাদু-যন্ত্র। পরীক্ষা করে যশপাল মহাখুশি।

রাত্তিরে অমরের খাবার নিয়ে যশপাল হাজির হল বন্দী-কুঠুরীতে। সবার অজান্তে যশপাল অমর সিং-এর কোমরে 'ম্যাজিক খাপ' পরিয়ে তাকে তৈরী করে রাখে। খাপের মধ্যে নকল রক্তও মজুত থাকে। যশপাল বা অমর সিং কারো চোখে ঘুম আসে না সারারাত।

ভোরের আলো ফুটতেই ডাকাত দলের প্রধানরা এক সঙ্গে সর্দারকে জানায় তাদের রায়—

"অমর সিং-এর শাস্তি মৃত্যু।"

"তবে সেই ভাবেই তাকে মারা হোক যেভাবে আর সব বেইমানকে মারা হয়েছে।"—ধীর, শান্ত কণ্ঠে বলে সংগ্রাম সিং।

"ওকে বাঁচতে দাও, সর্দার। ও তোমার একমাত্র বংশধর। তোমার একমাত্র পুত্র।"—কাতর স্বরে আবেদন করে যশপাল।

"অসম্ভব। এ প্রস্তাব অবান্তর।"—সংগ্রাম সিং-এর কণ্ঠ কঠিন।

"তা হলে একটু দয়া করো, সর্দার। এতদিন যে হাতে তাকে খাইয়েছি, সেবা-যত্ন করেছি সেই হাতেই তাকে খতম করার অনুমতি দাও। আমার হাতেই হোক তার মৃত্যু। মারা যাবার পর আমার হাতেই দাও তার লাশ। ওর মামার বাড়ির গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে ওকে পোড়াবো আমি।"—সানুনয়ে বলে যশপাল।

"আমার কোন আপত্তি নেই। অমর যদি আপত্তি না করে,

তবে তুমি যা চাইছ তাই হবে। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"—বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বলে সংগ্রাম সিং।

"যশপালের ইচ্ছাই আমার শেষ ইচ্ছা।"—ধীরগলায় এই কথা বলে অমর সিং সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তারপরে হাতজোড় করে বাপকে প্রণাম করে বলে, "আমি প্রস্তুত।"

অমরের দুই হাত উঠিয়ে বুকের উপরে আড়াআড়ি করে রেখে যশপাল তার নিজের কোমরের খাপ থেকে তুলে নেয় তার তলোয়ার। পাশেই জালা ভর্তি তীব্র বিষ। যশপাল সবার চোখের সামনে বিষের পাত্রে তার তলোয়ারের ফলাটা ডুবিয়ে নেয়। সবাই দেখে তাতে বিষ লেগেছে। এইবার তলোয়ারের ধারালো ডগাটা যশপাল ঠেকায় অমরের নাভির কাছে জামার ভাঁজে। অল্প থেমে সে জগদম্বার নাম স্মরণ করে একটা ঝট্‌কা চাপ দেয় তলোয়ারের মুঠিতে। প্যাঁচ শব্দে এক ঝলক রক্ত ছিটকে আসে। তলোয়ারটা অমর সিং-এর পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলে। পিঠের দিক থেকে বেরিয়ে আসা তলোয়ারের ডগা বেয়ে ঝরে পড়ে টাটকা রক্তের ধারা। আর্ত মরণ যন্ত্রণা উচ্চারণ করে অমর মাটিতে ঢলে পড়ার আগেই যশপাল তলোয়ার টেনে তুলে নিয়ে নিজের খাপে ঢুকিয়ে ফেলে। সংগ্রাম সিং দুই হাতে নিজের চোখ চেপে ধরে হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

যশপাল এগিয়ে এসে একটানে নিজের বলিষ্ঠ কাঁধের উপরে তুলে নেয় অমরের লাশ। তারপর সেই অবস্থাতেই লাফিয়ে ওঠে তার কালো ঘোড়ার পিঠে। সপাং করে এক চাবুকের ঘা মারতেই তীরবেগে ছুট লাগায় তেজী ঘোড়া।

অল্প দূর এগিয়েই তারা পড়লো পুলিশ দলের সামনা-সামনি। দু হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলো তারা পুলিশদলের কাছে। পুলিশদল বন ঘেরাও করে এগিয়ে আসছিল খাস আস্তানার দিকে।

তাদের নেতা। আগের দিনের সেই অফিসার। অমর সিং-কে দেখেই চিনলেন তিনি।

পুলিশদলের সঙ্গে তুমুল লড়াই হল সংগ্রাম সিং আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের। প্রাণপণ লড়াই করে সংগ্রাম সিং আর তার কয়েকজন বিশ্বাসী সঙ্গী মারা পড়লো। বাকীরা ধরা পড়লো পুলিশের হাতে। বিচারে তাদের কঠোর সাজা হল।

যে পুলিশ অফিসারকে অমর প্রাণে বাঁচিয়েছিল তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করে অমরকে বাঁচালেন সাজার হাত থেকে। আদালতের ক্ষমা পেলো অমর সিং।

অমর সিং এখন এক সুস্থ সৎ নাগরিকের জীবন কাটাচ্ছে। মামাদের সঙ্গে সে এখন করে খামারের কাজ। যশপালের বয়স বেড়েছে। এখনও সে অমর সিং-এর নিত্যসাথী।

ভানুমতীর খেল

বৈশালীর সওদাগর হীরা দত্ত। দেশবিদেশে তার কাজ-কারবার। কত লোক লস্কর। কত ধন-দৌলত, রত্ন-মাণিক্য। কিন্তু তার সংসারে শান্তি নেই। কারণ, তার নেই কোন ছেলে-মেয়ে। অবশেষে অনেক যাগ-যজ্ঞের ফলে তার ঘর আলো করে এলো এক অপরূপা কন্যা সন্তান। সওদাগর, সওদাগর-গিন্নী, লোক-লস্কর সবাই হল আনন্দে আটখানা। এ আনন্দ থাকলো না বেশি দিন।

মেয়ের বয়স তখন বছর খানেক। একদিন বাগানে দোলনায় শুয়েছিল মেয়ে। হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এলো এক বিশাল ঈগল। ঠোঁট আর পা দিয়ে বাচ্চার পোশাক আঁকড়ে ধরে আকাশে উড়লো সেই আজব ঈগল। ছুটে এলো দাস-দাসী, আত্মীয়-পরিজন। কিন্তু কিছু করা গেল না। শিকারী লাগালেন

হীরা দত্ত। লোক পাঠালেন। এদিকে-ওদিকে মেয়ে বা ঈগল, কিছুরই সন্ধান মিললো না। হতাশায় ভেঙে পড়লেন হীরা দত্ত। তাঁর স্ত্রী মেয়ের কথা ভেবে ভেবে শয্যা নিলেন। পুরস্কার ঘোষণা করলেন হীরা দত্ত। চর-অনুচর পাঠালেন দেশে দেশে কোন ফল হল না।

"সবই ভগবানের হাত। মানুষের করার কী আছে।"—বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হীরা দত্ত।

এ ঈগল আসলে ছিল এক শাপভ্রষ্টা যক্ষিণী। যক্ষরাজের অভিশাপে সে যক্ষপুরী থেকে পতিত হয়েছিল ঈগলের রূপে। অকাশে উড়তে উড়তে সে দেখতে পেলো হীরা দত্তের ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটিকে। ঠিক এমনি একটি মেয়ে তার ছিল যক্ষলোকে। সেই মেয়ের কথা প্রায়ই মনে পড়তো তার আর বেদনায় বুক ফেটে যেতো। হীরা দত্তের মেয়েকে নিয়ে সে তার মনের ব্যথা ভুলতে চাইলো।

নানা কলাবিদ্যায় পটীয়সী ছিল এই যক্ষিণী। যত্ন করে সে সেইসব বিদ্যা শিক্ষা দিতে থাকলো হীরা দত্তের মেয়েকে। মেয়ের নাম রাখলো ভানুমতী। যক্ষপুরীতে সে তার নিজের যে মেয়েকে রেখে এসেছিল তার নাম ছিল ইন্দুমতি। ইন্দু অর্থ চাঁদ। ভানু অর্থ সূর্য। এই ভাবেই সে আপন মেয়ে আর পালিতা মেয়ের নামের মধ্যে একটা মিল রেখে দিল। যতদিন গেল ভানুমতির রূপ-গুণও বাড়তে থাকলো তত। বনের মধ্যে বেড়ে উঠলেও যক্ষিণী কিন্তু ভানুমতিকে দিল শহর-গ্রাম, কুটীর-রাজমহল সব রকমের পরিবেশেই খাপ খাইয়ে নেবার আদর্শ শিক্ষা। লেখা-পড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে ভানুমতি এই মায়ের কাছ থেকে নাচ-গান-যাদু-বিদ্যাও শিখলো।

এমনি ভাবেই পার হয়ে গেল যক্ষিণীর পনের বছরের অভি-শাপের মেয়াদের সময়। যক্ষপুরীতে ফেরার জন্য আকুল হয়ে

উঠলো সে। ভানুমতীর কী হবে? সে মনুষ্য-সন্তান। তাকে যক্ষপুরীতে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

যক্ষিণী ভানুমতীকে কাছে ডেকে তার মাথায় সাদরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—"দেখ মা, এবার তো আমার ফিরে যেতে হয় যক্ষপুরীতে। কাল পূর্ণ হয়েছে। দুঃখ কোরো না। এখান থেকে সোজা পথে বনের ভিতর দিয়ে কয়েক দিন পশ্চিম দিকে হাঁটলেই পৌঁছে যাবে বৈশালীতে। তোমার বাবার দেশে। সেখানকার সওদাগর শ্রেষ্ঠ হীরা দত্ত তোমার বাবা। আমি স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বলবো যে শিগ্‌গিরই তুমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছ। সব শাস্ত্রে আমি শিক্ষিতা করেছি তোমাকে। তুমি অপূর্ব সুন্দরী। তুমি মহা গুণবতী। তোমার বিয়ের যোগ্য পাত্রও পথে অপেক্ষা করে রয়েছে তোমার জন্য। আশীর্বাদ করি। তুমি সুখী হও, মা।"

যক্ষিণীর কথা শেষ হতে ভানুমতী সাশ্রু নয়নে প্রণাম করে তার পায়। প্রণাম শেষে মাথা তুলে সে আর দেখতে পায় না যক্ষিণীকে। কখন সে অদৃশ্য হয়ে গেছে! আর দেরি করা নিরর্থক মনে করে ভানুমতী শুরু করে বৈশালীতে ফিরে যাবার আয়োজন। একটা পুঁটলীতে দুটো সাধারণ কাপড়-চোপড়, কিছু শুকনো খাবার আর একটু পানীয় জল বেঁধে নেয় সে। হাতে নেয় মশাল বাঁধা একটা লাঠি। কোমরে ঝুলিয়ে রাখে একটা তলোয়ার।

এইভাবে প্রস্তুত হয়ে ভানুমতী পা বাড়ায় পশ্চিমে অর্থাৎ তার বাপের দেশ বৈশালীর দিকে। পাহাড় ছেড়ে বনে নামে ভানুমতী। বন পেরুতে সময় লাগে পুরো তিনটি দিন। অবশেষে বনের শেষে তার চোখে পড়ে এক বিরাট রাজপুরী। শ্বেতপাথরের বিশাল প্রাসাদ। সামনে টলটলে জলভরা সুন্দর ঝিল। তার তীরে কত বাহারী বাহারী গাছের সারি। দেখে দু চোখ জুড়িয়ে যায়। ঝিলের জলে রাজহাঁসের ঝাঁক। যেন পুতুল-হাঁস। নড়েও না।

চড়েও না। ঘুমে আচ্ছন্ন। হাওয়ায় ভাসিয়ে নেয় এদিক-ওদিক। রকম-সকম দেখে অবাক হয় ভানুমতী। এক পা দু পা করে সে এগোয় প্রাসাদের দিকে। সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে বর্শাধারী বলবান দ্বাররক্ষী। চোখে পাতা পড়ে না। নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তি যেন। ভেতরে ঢুকে যায় ভানুমতী। কোনভাবে বাধা দেয় না তাকে দ্বাররক্ষী শান্ত্রী। অচল, অনড়, নিষ্প্রাণ পুতুল বুঝি সে। প্রাসাদের কার্নিসে বসা কাক-শালিক। তারাও যেন চলাফেরা, ডাকা-ডাকি ভুলে, কোন ফুস মন্তরে পুতুলটি হয়ে গেছে। মহলের পর মহল পার হয়ে যায় ভানুমতী। বাধা পায় না কোথাও কোন শান্ত্রী, পরিচারক বা প্রহরীর কাছে। সবাই নিথর, নিশ্চল, নীরব, প্রাণহীন পুতুলটি যেন।

বিশাল বিশাল ঘর। পাথর বাঁধানো বিরাট বিরাট চত্বর। বারান্দা। অলিন্দ। ঝাড় লণ্ঠন। আসবাবপত্র। সবই সুন্দর সাজানো। ঘোড়াশালে ঘোড়া। হাতিশালে হাতি। লোক-লস্কর। সেপাই-সান্ত্রী। পাত্র-মিত্র-সভাসদ। সবই আছে এই আজব রাজপুরীতে। সবাই আছে কিন্তু সাড়-সারা নেই কারো দেহে। সবাই যেন বেঁচে আছে এক আজব নিদ্রার রাজ্যে। কেউ দাঁড়িয়ে। কেউ বসে। কেউবা শুয়ে শুয়ে। পরম তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে আছে এক মায়াজালের নিদ্রায়।

ঘুরতে ঘুরতে ভানুমতী গিয়ে ঢুকলো পেছন দিকের এক বিস্তৃত মহলে। সেখানে এক মণিমুক্তার সাজানো ঘরে ঢুকে বিস্ময়ের ঘোর লাগে ভানুমতির চোখে। সোনার খাটে, হীরা-মাণিক সাজানো বিছানায় পড়ে আছে ঘুমে অচেতন এক অপূর্ব সুন্দর যুবাপুরুষ। পরনে রাজকুমারের পোশাক। দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে এরই একটি পূর্ণ ছবি। শরীরে রাজবেশ। ডান হাতে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে এক হীরার আংটির প্রতিকৃতি। ভানুমতীর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ-ই রাজপুরীর রাজা। ধীরে ধীরে

কাছে এগিয়ে এসে ভানুমতী ভালোভাবে লক্ষ্য করে সব। রাজার ডান হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে। আঙ্গুলে সেই ছবিতে আঁকা আংটি নেই। বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে আবিষ্কার করে, নিরন্তর আংটি ব্যবহার করার চিহ্ন রয়েছে ডান হাতের সেই আঙ্গুলে।

এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে ঘুমন্ত রাজার পায়ের কাছে বিছানার উপরে সে দেখতে পায় একটা মখমলের বাক্স। বাক্সটা খুলতেই সারা ঘর আলো করে ঝলমলিয়ে ওঠে আংটির হীরা।

মনে মনে ভাবে ভানুমতী—'এইটাই বোধ হয় সেই জিয়ন কাঠি। যার ছোঁয়ায় জেগে উঠবে রাজপুরীতে সব লোক বা রাজপুত্তুর। দেখাই যাক না পরখ করে।'

বাক্স থেকে বের করে নিয়ে ভানুমতী আংটিটা রাখে রাজপুত্তর হাতের উপর। অমনি তার শরীরে আসে প্রাণের সাড়া। নড়ে চড়ে ওঠে ঘুমন্ত রাজকুমার। ঘুলঘুলির ভেতরকার পায়রাও বুঝি বাক্-বাকুম শব্দের অর্ধেকটা উচ্চারণ করে ওঠে। ভানুমতী তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নেয় আংটিটা। বাক্সে ভরে আবার রাখে ঘুমন্ত রাজকুমারের পায়ের কাছে বিছানার উপরে।

ঘামে, ময়লায় আর পথশ্রমে বড় বিচ্ছিরি, কুরূপা দেখাচ্ছে তাকে এখন। দেওয়ালের দর্পণে নিজেকে দেখে আঁৎকে ওঠে ভানুমতী। কতদিন চুলে চিরুনী পড়েনি। স্নান হয়নি কতদিন। পরনের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে, ফেটে, ফেসে গেছে গাছের ডালপালা আর কাঁটার খোঁচা খেয়ে। এই পোশাকে কোন রাজার সামনে দাঁড়ানো যায় না। আগে স্নান করে পোশাক পাল্টাতে হবে। তারপরে রাজদর্শন। ততক্ষণ আগের মত ঘুমিয়ে থাকুন রাজা মশাই নিজের সোনার পালঙ্কের আরাম শয্যায়।

নিজের পুঁটুলী তুলে নিয়ে ভানুমতী তাড়াতাড়ি ছুটে চললো ঝিলের দিকে। ঐ ঝিলের টলটলে জলে স্নান করে স্নিগ্ধ নির্মল করে নেবে সে তার শরীর। সাবান মাখবে। পরবে ফর্সা শোভন

পোশাক। মায়ের তৈরী সুন্দর একটা রেশমী পোশাক এখনো রয়েছে তার পুঁটুলীতে। গহনাও রয়েছে তু চারটে বেশ চটকদার।

গলানো স্ফটিকের মত নির্মল টলটলে জল। শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঘাট। জলে পা ঠেকাতেই আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠলো ভানুমতীর মন। পা ছড়িয়ে ঘাটলার উপরে বসে আপন মনে যক্ষিণীর দেওয়া সুবাস-সাবান ঘষতে থাকে সে তার গায়ে।

হঠাৎ তার নজর পড়লো ঘাটলার পাশে এক গাছতলায়। দেখলো একটা শীর্ণা, তুস্থা মাঝ-বয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে আর করুণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মেয়েটিকে ভানুমতী ডাকলো নিজের কাছে। কাছে আসতে ভাল করে মেয়েটিকে দেখলো ভানুমতী। বেশ কালো গায়ের রং। একটা চোখ ট্যারা। দেখতে তেমন ভাল নয়। ভানুমতীর বড় মায়া হয় মেয়েটির উপর। সে কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করে—"কী বাছা, কাঁদছো কেন? কী হয়েছে তোমার?"

"আমার স্বামী আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার আর কেউ নেই। তাই আমি বনে যাচ্ছি। স্বামীর কথার অবাধ্য হবার ফল আমি পেয়েছি। এবার আমি বনে যাচ্ছি। এখন বনের বাঘ-ভল্লুকে যদি আমাকে খায় তবেই আমার শান্তি হবে। এ জীবন আর আমি রাখতে চাই না। মরতেই আমি চাই।" বিলাপের সুরে বলে মেয়েটি।

ভানুমতীর দয়া হয়। সে বলে—"এত ভেবো না। আমি তোমার খাওয়া-পরা, দেখা-শোনার ভার নিলাম। আমার বাবা মস্ত মানুষ। আমার সঙ্গে যদি তোমাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাই, তবে তোমার আর কোন কষ্ট থাকবে না। ফাই-ফরমাস খাটবে আর মনের সুখে খেয়ে-পরে জীবন কাটাবে। আমি স্নান সেরে একটু পরেই আসছি। তুমি বাছা, ততক্ষণ এগিয়ে গিয়ে ঐ প্রাসাদের কাছে একটু আমার জন্যে অপেক্ষা কর।"

প্রাসাদের কাছে গিয়ে মেয়েটির কৌতূহলের মাত্রা সীমা হারিয়ে ফেলে। এক পা এক পা করে চলতে চলতে গিয়ে অবশেষে সে হাজির হয় সেই কক্ষে যেখানে অচেতন হয়ে পড়ে আছে রাজকুমার। প্রথম প্রথম একটু হকচকিয়ে যায় সে এই সব মণি-মাণিক্যের জৌলুস দেখে। চোখ ধাঁধিয়ে যায় তার। অবাধ্য জেদী মেয়েদের দুঃসাহস একটু বেপরোয়া হয়। অল্প পরেই মেয়েটি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। বাঁধা দেবার বা প্রতিবাদ করবার কেউ নেই দেখে সে হয়ে ওঠে চটুল। ঘুমন্ত রাজকুমারের গায়ে ধাক্কা দেয় সে। রাজকুমার নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। ডাকে। সাড়া পায় না। ঠেলাঠেলি করে। রাজকুমার জাগে না তবুও। নড়েও না।

হঠাৎ মেয়েটির চোখে পড়ে রাজকুমারের পায়ের দিকে। একটা ঝকমকে আংটি পড়ে রয়েছে বিছানার উপরে। তাড়াতাড়িতে ভানুমতী ভালভাবে বন্ধ করে যেতে পারে নি বাক্সটা। এখন মেয়েটি রাজকুমারকে ধরে ঠেলাঠেলি করতেই বাক্স থেকে গড়িয়ে পড়েছে আংটি।

"এ নিশ্চয়ই এই ঘুমনো লোকটার আংটি। খুলে পড়ে আছে। পরিয়ে দিই ওর হাতে।" মনে মনে এই কথা বলে মেয়েটি আংটি তুলে পরিয়ে দিল ঘুমন্ত রাজকুমারের হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে উঠে বসেই সে দেখতে পেল ঐ মেয়েটিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে রাজপুত্র মেয়েটিকে বসালো তার পাশে।

"কে তুমি ভদ্রে, দীর্ঘ দিনের অভিশাপ থেকে আজ আমাকে বাঁচালে তোমার কল্যাণ স্পর্শে। কৃতজ্ঞ আমি তোমার কাছে। তোমার কল্যাণে আমার রাজপুরীর সবাই আজ অভিশাপ মুক্ত। এক রাক্ষস তার মায়াবলে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল আমাদের। সবাই ফিরে পেয়েছে প্রাণ তোমার গুণে, তুমি আমাকে আংটি পরানোতে। আমি তোমাকে করবো আমার রানী। বল দেবী

কী তোমার পরিচয় ?"—কৃতজ্ঞতায় বিগলিত কণ্ঠে বলে রাজকুমার।

মেয়েটির মনে দুষ্ট, বুদ্ধি জাগে। মিথ্যা করে সে বলে—"আমি এক রাজকুমারী। আমার দাসী এক্ষুণি আসছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভানুমতী এসে হাজির হল সেখানে। রাজকুমারকে জেগে বসে থাকায় আর তাঁর পাশে সেই মেয়েটিকে বিছানার উপর বসে থাকতে দেখে ভানুমতী ব্যাপারটা কিছুটা অনুমান করে নিতে পারলো। সে বুঝতে পারলো যে মেয়েটিই এই অঘটন ঘটিয়েছে। অঘটনের মূল যে অনেক গভীরে বিস্তৃত হয়েছে তা ভানুমতী তখনই অনুমান করতে পারলো যখন মেয়েটি তাকে দেখিয়ে রাজপুত্রকে বললো—"ঐ তো আমার দাসী এসে পড়েছে।"

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো ভানুমতী। তবুও তার শিক্ষা-সংস্কৃতি তাকে রূঢ় হতে দিল না। মেয়েটির কথায় গ্রাহ্য না করেই সে সুললিত কণ্ঠে রাজ বন্দনা শুরু করলো। ছন্দবদ্ধ শ্লোকে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালো তার নতুন জীবন লাভের আনন্দে। ভানুমতীর অনিন্দ্য রূপ লাবণ্য, তার মার্জিত চলন-বলন আর বীণা-নিন্দিত কণ্ঠ-গৌরব এক মুহূর্তেই রাজাকে জানিয়ে দিল তার জাতি শীলের পরিচয়।

মুগ্ধ নয়নে, আবেগ ভরা মনে রাজকুমার এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ভানুমতীর দিকে। কি অপূর্ব রূপ-লাবণ্য। কি অপরূপ পরিশিলিত আচার-আচরণ। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয় না—কে দাসী। তবুও সঠিক ব্যাপারটা তিনি শুনতে চান ভানুমতীর মুখে। রাজার কৌতূহল দূর করার জন্য ভানুমতী সব কথা খুলে বলে। ভানুমতির সব কথাই বিশ্বাস করে রাজকুমার। কিন্তু ভানুমতী চায় ঐ মেয়েটির মুখ থেকে সঠিক কথা শোনাতে।

"কতকগুলো কাগজের ফালিতে আমি আলগা ভাবে লিখবো দাসী আর রানী। এক একটা ফালিতে থাকবে এক একটি কথা—দাসী অথবা রানী। একটা পাত্রের মধ্যে এই দুই রকমের লেখা কাগজগুলো

ঢেলে দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দেবেন আপনি। আমার চোখ বেঁধে দেবেন শক্ত করে। যদি আমি দাসী না হই তবে ঐ অবস্থাতেই না দেখে আমি যে সব কাগজের টুকরো বের করবো তাতে দাসী লেখা থাকবে না। কি গো বাছা, এতে তুমি রাজি তো?"

নীরবে মাথা নেড়ে সায় দেয় সেই মেয়েটি। রাজার আদেশে এক জন এনে হাজির করে পাঁচ আঙ্গুল চওড়া আর আধ হাত লম্বা পুরু ধরনের পাঁচ ছয় ফালি কাগজ। ভানুমতী ভাঁজ করে করে লম্বার দিকে তিনটে সমান অংশে ভাঁজের চিহ্ন ফেলে প্রতিটি লম্বা ফালিতে। এর পরে সে দুই প্রান্তের দুই খোপে লেখে দাসী আর মাঝের খোপে লেখে রানী। এই একই পদ্ধতিতে ছয়টা কাগজের দুই প্রান্তের বারোটা খোপে দাসী আর মাঝখানের মোট ছয়টা খোপে ভানুমতী

লিখে ফেলে রানী। এই বার ভাঁজের দাগ বরাবর সাবধানে ছিঁড়ে এই মোট আঠারোটা খোপকে আলাদা করে ফেলে ভানুমতী। এর ফলে পাওয়া যায় মোট আঠারোটা ছোট ছোট কাগজের ফালি। এই ফালিগুলোর বারোটাতে দাসী আর ছয়টাতে রানী লেখা আছে।

সামনেই পড়ে ছিল একটা বালতির আকারের বড় ফুলদানি। এই খালি পাত্রটার মধ্যে আঠারোটা কাগজের ফালি রেখে ভানুমতী দেয় রাজকুমারের হাতে। তার অনুরোধ মত রাজকুমার আচ্ছা করে নেড়ে-চেড়ে মিশিয়ে দেন সবগুলো কাগজের ফালি। ভানুমতীর অনুরোধে এবার তিনি ভানুমতীর দুচোখ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেন শক্ত কাপড় দিয়ে। একটা বড় মাপের রুমাল দিয়েও তিনি ঢেকে দেন ভানুমতীর হাত গলানো কাগজ-ফালির পাত্রটা।

এর পরে শুরু হয় ভানুমতীর কেরামতি। রুমালের তলায়

সাবধানে দু হাত চালিয়ে ভানুমতী বেছে বেছে শুধু সেই খণ্ডগুলোই বাইরে ফেলে যেগুলোর দু পাশের ধার এবড়ো-খেবড়ো ভাবে ছেঁড়া। যেগুলোর তিন পাশ সমান ভাবে কাটা আর একধার এবড়ো-খেবড়ো ভাবে হাতে ছেঁড়া সেগুলো সে বাইরে বের করে না। কারণ ওগুলো সব লম্বা ফালির দুই প্রান্ত থেকে ছেঁড়া দাসী লেখা টুকরো। লম্বা কাগজ ফালিগুলোর চারপাশ সমানভাবে আগে থেকে কাঁচিতে ছাঁটা ছিল। তাই তার চারধার ছিল সমান আর মসৃণ। ভাঁজ করে হাত দিয়ে ছেঁড়ার পরে মাঝখানের 'রানী' লেখা টুকরোর দুধারে পড়েছে হাতে ছেঁড়া এবড়ো-খেবড়ো ধার আর দুই প্রান্তে পড়েছে সমান মসৃণ, কাঁচিতে ছাঁটা ধার। মায়ের কাছ থেকে লেখা এক মজার যাদু কৌশলের কারসাজিতে কাজ হাসিল করে ভানুমতী। রাজা অবাক হয়ে দেখেন। আপন মহিমায় ভানুমতী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে রানীর যোগ্য অধিকারে। খুশিই হন তিনি। মেয়েটির মুখ শুকিয়ে ওঠে। ছয়টা কাগজ ফালি নির্ভুলভাবে বের করার পর রাজকুমার ভানুমতীর চোখের বাঁধন খুলে দেন।

ভানুমতীর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে মেয়েটি ঘাবড়ে গিয়ে তার দোষ স্বীকার করে। বারে বারে রাজকুমার আর ভানুমতীর পায়ে পড়ে সে ক্ষমা চাইতে থাকে। ভিক্ষা চাইতে থাকে প্রাণ।

রাজকুমারের কাছে ভানুমতী প্রকাশ করে তার সত্যিকারের পরিচয়। রাজকুমার ভানুমতীর বাবা মার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠান বিশেষ রাজদূত। তাদের সঙ্গেই ভানুমতী ফেরে তার বাপ-মায়ের কাছে। মহাধূমধামের সঙ্গে সেই রাজকুমার—মহারাজা বীরেন্দ্রকেশরীর সঙ্গে বিয়ে হয় ভানুমতীর। সুখী হন মহারাজা বীরেন্দ্রকেশরী। খুশি হয় মহারানী ভানুমতী। মহারাজা জামাতা পেয়ে গর্বে বুক ভরে ওঠে সওদাগর হীরা দত্তের। সেই মেয়েটিকে পরিচারিকা হিসাবে নিজের বাড়ীতে বহাল করেছে বণিক হীরা দত্ত। বাড়ীতে কত লোক। কত কাজ। না হয় থাকলোই একজন বাড়তি কাজের লোক।

সোনাপুরের সোনার সংসার

রাম আর সীতার বিয়ে হয়ে গেল। সীতাকে নিয়ে রাম পরম সুখে সংসার করতে লাগলো। এ রাম-সীতা রামায়ণের রাম-সীতা নয়। রামের বাড়ি সোনাপুর। বীর নগরের চাষী মঙ্গল দাসের আত্মরে মেয়ে সীতা। সীতার চেয়ে বছর চারেকের বড় মঙ্গল দাসের একমাত্র ছেলে হীরা দাস।

সীতার বয়স যখন ষোল তখন তার বিয়ে হল সোনাপুরের সম্পন্ন কৃষক মঙ্গল দাসের একমাত্র ছেলে রাম দাসের সঙ্গে। সুখে কাটতে থাকলো রাম-সীতার জীবন। এ সুখ বেশি দিন থাকলো না। বিয়ের এক বছর পরে হঠাৎ মারা গেল সীতার শ্বশুর মঙ্গল দাস। রাম দাস পড়লো ফাঁফরে। তেমন বিষয় বুদ্ধি তার ছিল না। শরিকেরা নানা ছল-চাতুরী করে তার সব জমি হাতিয়ে নিলো।

বাপের কোন জমি-জায়গা পেল না রাম। থাকার ভিটেটা শুধু বেহাত হল না। এই যা রক্ষে।

কী আর করে। পেট চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে রাম দাস চাকুরী নিল সোনাপুরের চিনি কলে। খুব সরস জমি সোনাপুরের। এ জমিতে আখ জন্মাতো খুব ভাল। এমন ভাল আখ আশপাশে আর কোথাও জন্মাতো না। দূর দূর থেকে চিনিকলের মালিকরা এসে কিনে নিয়ে যেতো সোনাপুরের আখ। তারপর দেখতে দেখতে একদিন সোনাপুরেই বসে গেল এক চিনিকল। সোনাপুরের আখ সোনাপুরের কলেই চিনি হয়ে উঠতে থাকলো। আশপাশের নানা গাঁয়ের লোকেরাই শ্রমিক হিসাবে খাটতে লাগলো চিনিকলে। চাষীরা বাড়তি উৎসাহে করতে থাকলো আখের চাষ।

কারখানাতে কাজ করতে এলো নানা জাতের নানা ধরনের লোক। সবার স্বভাব-চরিত্র সমান নয়। কেউ ভালো। কেউ মন্দ। সচরাচর যেমনটি হয়ে থাকে। কারখানা বসার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বসতে থাকলো নানা দোকানপাট আর ব্যবসা। জুয়োর আড্ডা বসলো। কারখানার ফটকের কাছেই বসলো মদের দোকান। সোনাপুরে নেমে এলো অশান্তির অমানিশা। প্রকৃতির শান্ত, পবিত্রতা দূর হল সোনাপুর থেকে। হৈহল্লা, হট্টগোল। চুরি জোচ্চোরী। মারা-মারি, কাটাকাটি হয়ে উঠলো সোনাপুরের নিত্যদিনের ঘটনা।

একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হল সীতার। রামের যা রোজগার তাতে তার সংসার বেশ ভালভাবেই চলে যায়। বেশ সুখে থাকে সে সীতা আর তার ছেলেকে নিয়ে। এমনি বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল রাম-সীতার পরিবারের। আস্তে আস্তে সুখের সংসারে শনির দৃষ্টি পড়লো। রামের জুটলো কয়েকজন খারাপ সঙ্গী। তারা রামকে মদ খাওয়া শেখালো। এদের মধ্যে একজন হলধর। সে খুব শয়তান।

প্রথম প্রথম সে নিজের পয়সায় মদ কিনে খাওয়ায় রামকে। রাম খেতে চায় না। তবুও জোর করে সে রামকে মদ খাওয়ায়।

"খেয়ে দেখো না, মাইরী। কি মজার জিনিস। মানুষ হয়ে জন্মে যদি এক আধ ঢোঁক সুরাই না খেলে তবে কুকুর হয়ে জন্মাতে বারণ করেছিল কে? খাও না। পয়সা তো আমার। খাও, খাও। যত পার খাও। কুছ পরোয়া নেই।"—মত্ত, জড়িত গলায় উৎসাহ দিয়ে বলে হলধর।

একদিন। দুদিন। রাম এড়িয়ে চলে হলধরকে। কিন্তু হলধর নাছোড়বান্দা। রামকে ছাড়ে না সে। অবশেষে হলধরের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হয় রাম। ধীরে ধীরে হলধরের পয়সায় মদ খেয়ে খেয়ে রাম জড়িয়ে পড়ে মদের নেশার ফাঁদে। এবার হলধরের পালা। রামকে দিয়ে মদ কিনিয়ে এবার রামের পয়সায় চলে নেশার চক্র। রামের উপার্জনের সব টাকা এখন সরাসরি ঢুকতে থাকে মদের দোকানীর পকেটে। ঘরে ছেলে বৌ কী খাবে, কী পরবে খেয়াল থাকে না রামের। দিনরাত সে চুর হয়ে থাকে মদের নেশায়।

পেট ভরে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না। ছেলেটা থাকে উপোসী। এ অবস্থা সইতে না পেরে সীতা পরের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ নিতে বাধ্য হল। রামের কোন হুঁস নেই এ ব্যাপারে। নেশার সময় মদ তার চাই-ই চাই। মাইনের টাকায় টান ধরে মদের খরচে। সীতাকে মার-ধোর করে তার গয়নাগাটি কেড়ে নিয়ে বন্ধক দেয় রাম। সেই টাকাতে বসে মদের আসর। চলে হৈ হুল্লোড়। অসহায় সীতা মুখ বুঝে সহ্য করে আর চোখের জলে বুক ভাসায়। তার রামের একি অধঃপতন হল! ভাবে আর ভাবে সে। প্রাণ ভরে ডাকে ভগবানকে।

কেবলমাত্র সীতাই নয়। সোনাপুরের অনেক বৌ-ঝির কপালেই জোটে এই দুর্দশা, অনেক সোনার সংসারেই জ্বলে অশান্তির আগুন। এই সব কিছুর মূল হচ্ছে ঐ সর্বনেশে মদের দোকান আর কতকগুলো

কুলোকের চক্রান্ত। ঐ মদের দোকানের বিষ নিশ্বাসেই পুড়ে মরছে সোনাপুরের অনেক ছেলে-মেয়ে, ঝি-বৌ। অসহায় ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা। অভিশাপ দেয় মদের দোকানকে। কিন্তু কোন ফল ফলে না। অবাধগতিতে চলে মদের দোকানের কাজ কারবার। ফুলে লাল হয় মদের দোকানী আর তার দালালরা।

পরের বাড়িতে বাসন মেজেও যখন আর সীতা তার কোলের ছেলেকে ঠিকমত লালন-পালন করতে পারছিল না, তখন সে অসহায় হয়ে চলে গেল বাপের বাড়ি। সীতা আর তার ছেলেকে পেয়ে সবাই খুশি হল। মঙ্গল দাস আর তার বৌ তো নাতীকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। বারে বারে তারা প্রশ্ন করতে থাকলো জামাই এলো না কেন? সে কেমন আছে? সীতা নানা ভাবে সে প্রসঙ্গ ঠেকিয়ে রেখে বললো যে কারখানায় কাজের খুব চাপ।

"মা, তোর আর আমাদের নাতীর শরীর এত কালো আর দুর্বল হল কী করে?"—সস্নেহে প্রশ্ন করে সীতার মা।

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সীতা বলে, "কি যে এক সর্বনেশে জ্বর এসেছে সোনাপুরে। কী বলবো, মা। ঐ জ্বরে ভুগেই এই দশা হয়েছে। যাক এবার তো হাওয়া বদল হল। দেখি শরীর সারে কিনা।"

শরীর সত্যিই সারে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার পেটে পড়তে মা-ছেলে দুজনেরই স্বাস্থ্য ভাল হয়। সাত দিন পেরোতেই সবার নজরে পড়ে এই পরিবর্তন।

পনের দিন কেটে গেল তবুও রাম একবার এলো না দেখে মঙ্গল দাস খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে তার ছেলে হীরা দাসকে বার বার তাগাদা দিতে থাকলো নিজে সোনাপুর গিয়ে রামকে ধরে নিয়ে আসার জন্য।

এবার প্রমাদ গুনলো সীতা। সোনাপুরে গেলে তো হীরা দাস সব জেনে ফেলবে। সেটা হবে এক বিরাট কেলেঙ্কারীর ব্যাপার।

তার চেয়ে সে নিজেই বাবা-মার অজান্তে তার দাদাকে খুলে বলবে সব কথা।

সেদিন রাতে একান্তে বসে সীতা সবিস্তারে তার দুঃখের কাহিনী শোনালো তার একমাত্র সহোদর হীরা দাসকে। সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো হীরা দাস। সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারলো না সে। যেমন করেই হোক রামকে ফিরিয়ে আনতেই হবে নেশার পথ থেকে। কৈ রাম তো এমন ছিল না। সে ছিল অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির ছেলে। কর্তব্যপরায়ণ আর স্নেহশীল। অসৎ সংসর্গই তাকে নামিয়ে এনেছে এই সর্বনাশের পথে। সোনাপুরের আরো অনেকে এমনিভাবে হয়েছে অসৎ পথের পথিক। যেমন করেই হোক এর একটা প্রতিকারের পথ বের করতেই হবে। সারারাত বসে বসে ভাবে আর ভাবে হীরা দাস।

স্নায়ুর চাপে আর ক্লান্তিতে বোধ হয় ভোরের দিকে হীরা দাসের দু'চোখের পাতা অল্পক্ষণের জন্য একটু এক হয়েছিল। তন্দ্রায় ছায়ায় এক হাল্কা স্বপ্নের ঘোরে হীরা দাস দেখলো তার বন্ধু রূপেশকে। অনেকদিন দেখা নেই রূপেশের সঙ্গে। হঠাৎ ভোরের স্বপ্নে রূপেশের দেখা পেয়েই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে হীরা দাস তার চৌকি ছেড়ে। তাই তো রূপেশের সঙ্গে পরামর্শ করলে সে নিশ্চয়ই একটা ভালো সমাধানের সূত্র বের করতে পারবে এই মাতাল সমস্যার। রূপেশের বুদ্ধি খুব তেজী। তা ছাড়া অনেক যাদুর কৌশল তার জানা। যেমন করেই হোক একটা ভাল সমাধান সে করতেই পারবে। সকালে উঠেই হীরা দাস এক জরুরী চিঠি পাঠালো রূপেশের কাছে। বিশেষ অনুরোধ রইলো যাতে সে চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসে হীরা দাসের বাড়ি।

চিঠি পাওয়ামাত্র নয়। চিঠি পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে রূপেশ এসে হাজির হল হীরা দাসের আস্তানায়। বন্ধুর কাছে তার বোনের সমস্যা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করলো হীরা দাস। শুনে খুব বেদনা

বোধ করলো সে। নিজের বোনের মতই সে স্নেহ করে সীতাকে। সীতার সংকট সে তো তার নিজেরই বোনের সংকট। সংকট মোচনের যোগ্য ব্যবস্থা করার চিন্তায় মগ্ন হল রূপেশ। স্নান-খাওয়া প্রায় বন্ধ। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রূপেশ কুমার।

তিন দিন ধরে ভাবনা-চিন্তার পর রূপেশ বললো—"পেয়েছি হে, পেয়েছি একটা সুন্দর উপায় পেয়েছি। শুধু সীতার নয় সোনাপুরের অনেক ভাঙ্গা পরিবারই জুড়তে পারা যাবে এই উপায়ের দৌলতে। তবে ভাই, তার আগে দরকার একজন টিন ঝালাই করার কারিগর। এই কারিগরের বাহাদুরীর উপরই নির্ভর করবে আমাদের উপায়ের পুরো সাফল্য। পারবে জোগাড় করতে একজন বিশ্বাসী অথচ ভাল কারিগর?"

গাঁয়েই ছিল এক ওস্তাদ ঝালাই মিস্ত্রী। হীরা দাস তাকে গিয়ে ধরলো—"কাকা, আমার এই বন্ধুর জন্য একটা যাদুর যন্তর বানিয়ে দিতে হবে খুব গোপনে। কেউ যেন জানতে না পারে।"

মিস্ত্রী রাজী হল। খুব গোপনেই সে বানিয়ে দেবে যাদুর যন্ত্র। এমন কি তার নিজের বৌয়ের কাছেও গোপন কথা প্রকাশ করবে না বলে কথা দিল সে। রূপেশের দরকার একটা সাধারণ মাপের চেয়ে একটু বড় ফুঁদেল। বোতলে তেল ঢালার জন্য সাধারণত যেমন টিনের ফুঁদেল ব্যবহার করা হয় তেমনি একটা টিনের ফুঁদেল বানাতে হবে। তবে এর মধ্যে একটু কারসাজি থাকবে। ফুঁদেলের থাকে দুটো অংশ। একটা অংশ শঙ্কু (cone)-এর মত। এই শঙ্কুর মত অংশের দুটো মুখ। একটা ছড়ানো। একটা চাপা। এই চাপা অংশে জোড়া থাকে চওড়া থেকে ক্রমশঃ সরু হওয়া একটা নল। ফুঁদেলের শঙ্কুর মত অংশের চওড়া মুখে তরল ঢালা হয়। এই ছড়ানো তরলের ধারা শঙ্কুর চাপা মুখে জড়ো হয়ে পড়ে নলের চওড়া মুখে। সেই নল বেয়ে তরলের ধারা আরো সরু হয়ে অবশেষে গিয়ে ঢোকে বোতলের সরু মুখে। রূপেশের ফুঁদেলটাতে একটা বাড়তি কারসাজি

থাকবে। এই ফুঁদেলে থাকবে একটার বদলে দুটো শঙ্কু অংশ। একটার উপরে আর একটা। প্রথমে বানাতে হবে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বড় মাপের একটা মামুলী ফুঁদেল। তার পরে সেই
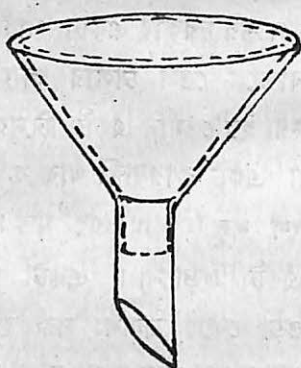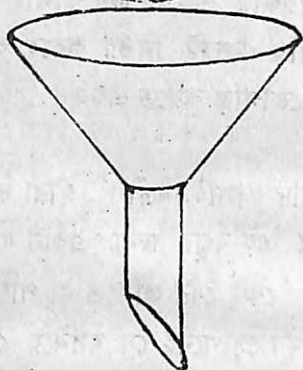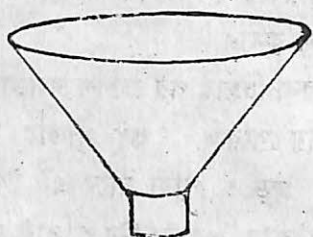
ফুঁদেলের শঙ্কু অংশের চেয়ে সামান্য একটু বড় মাপের মুখওয়ালা এমন আর একটা শঙ্কু অংশ বানাতে হবে যেটাকে ফুঁদেলটার নিজের শঙ্কু অংশের উপরে ঝালাই করে আটকে দিলে এই দুই নম্বর শঙ্কু আর

আসল ফুঁদেলের নিজের শঙ্কু অংশের মাঝখানে একটু জায়গা থাকে। এই দুই নম্বর শঙ্কুর নিচের অল্প পরিসর দিকটাতেও ঝালাই করে লাগানো থাকবে খাটো এক টুকরো নল অংশ। এই নল অংশ সামান্য দূর অবধি ঢুকে থাকবে আসল ফুঁদেলের নলের মধ্যে। আসল ফুঁদেলের শঙ্কু অংশের চওড়া মুখের ধারের কাছে উপরের দিকে থাকবে একটা ছোট ফুটো। এ ফুটো এমন জায়গায় হবে যাতে এটা আঙ্গুল দিয়ে টিপে বন্ধ করে রাখা যায়। আবার ইচ্ছা মতন আঙ্গুলের চাপ হালকা করে ফুটো দিয়ে ভেতরে বাতাস ঢোকানো যায়।

রূপেশের সামনে বসে তার নির্দেশ মত যাদুর ফুঁদেল বানায় ঝালাই মিস্ত্রী। সব কাজ শেষ হতে রূপেশ ফুঁদেলটা সোজা করে ধরে ডান হাতে। তার আংটি পরার আঙ্গুল দিয়ে সে চেপে ধরে ফুঁদেলের নলের তলা। এর পর সে এক মগ জল নিয়ে ঢালে সেই সোজা করে ধরে রাখা ফুঁদেলের ভেতরে তার বাঁ হাত দিয়ে। ফুঁদেল জলে ভরে ওঠে। এবার মগ নামিয়ে বাঁ হাত দিয়ে সে এমন ভাবে সেই ফুঁদেলটা ধরে যাতে ফুঁদেলের শঙ্কু অংশের উপর দিকে বাইরের দেওয়ালে যে ফুটোটা করা হয়েছে সেই বিশেষ ফুটোটা ভাল ভাবে চাপা পড়ে তার বাঁ হাতের তর্জনীর তলায়। এই বিশেষ ফুটোটা বাঁ তর্জনীতে ভালভাবে চেপে ধরে এরপর রূপেশ তার ডান হাত সরায় ফুঁদেলের নলের খোলা মুখ থেকে। সর সর করে সব জল পড়ে যায় ফুঁদেল থেকে।

এবার রূপেশ হীরা দাসকে বলে, "কী ভাই, ফুঁদেলের সব জলই তো পড়ে গেছে। কী বল? আর কোন জল নিশ্চয়ই নেই এতে। কী মনে হয় তোমার?"

"তা তো বটেই। সব জলই তো ঢেলে দিলে তুমি।"—উত্তর করে হীরা দাস।

"তবে এইবার দেখ মজা। ভালো ভাবে তাকিয়ে থাকো ফুঁদেলের নলের তলায়। আমি মন্ত্র পড়ছি। আবাম-বাম-সাবাম।

আয় নেমে আয় জল।”—রূপেশের কথা শেষ হতে না হতেই টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ে ফুঁদেলের নলের মুখ বেয়ে।

“এই বার বন্ধ হ।”—বলে রূপেশ ফুঁ দেয় ফুঁদেলে। জল পড়া বন্ধ হয়।

“আবার পড়।”—বলে রূপেশ ফুঁদেলে ফুঁ দিতেই আবার ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে ফুঁদেলের নল দিয়ে। কাণ্ড দেখে থ হয়ে যায় হীরা দাস।

“এই ফুঁদেলের যাদুই ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করবে তোমার ঐ সোনাপুরের মাতালদের।”—হাসতে হাসতে বলে রূপেশ।

কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে বসে থাকে হীরা দাস।

“আচ্ছা তবে আর একবার ব্যাপারটা করে দেখাই একটু অন্যভাবে। দেখ, বুঝতে পার কিনা কিছু।”—কথা শেষ করে আবার আগের মতই ফুঁদেলটাতে জল ভরে। নলের মুখ দিয়ে সব জল ফেলে দিয়ে বাঁ হাতে ফুঁদেলটা তুলে নেয় রূপেশ। এর পর একটা ন্যাকড়া দিয়ে ফুঁদেলটার চারদিক মুছে শুকিয়ে নিয়ে রূপেশ এগিয়ে আসে হীরা দাসের খুব কাছে। হীরা দাসের পেটের কাছের জামাটা গুটিয়ে উঠিয়ে দিয়ে তার পেটে ফুঁদেলের মুখটা চেপে ধরে রূপেশ বলে, কাশো। হীরা দাস খক্ করে কাশে। তার কাশির সঙ্গে সঙ্গে ফুঁদেলের নলের মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কিছুটা জল। রূপেশের কথা মত আবার কাশে হীরা দাস। আবার কিছুটা জল বেরয় ফুঁদেলের নল-মুখ দিয়ে। মনে হয় যেন হীরা দাসের পেট ফুঁড়ে কাশির ধমকে জল বেরুচ্ছে ফুঁদেলের ভেতর দিয়ে।

“কেমন বোধ হচ্ছে ব্যাপারটা?”—প্রশ্ন করে রূপেশ।

“যাদু হিসাবে মন্দ লাগছে না। তবে এই যাদু দিয়ে মাতালের মদ খাওয়ার বদ-অভ্যাস ছাড়ানো যাবে কেমন করে তা বুঝতে পারছি না, ভাই রূপেশ।”—উত্তর দিল হীরা দাস

“যথা সময়ে সব বুঝবে বন্ধু। এখন একটু ধৈর্য ধরো আর দেখতে

থাকো আমি কী করি। যা সাহায্য আমার দরকার তা চুপচাপ করে যাও তবেই স্থফল ফলবে।”

অল্পদিন পরেই সোনাপুরে এক সাধু বাবার আবির্ভাব ঘটলো। চিনিকলের সামনে যে বড় বটগাছ, সেই বটগাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসলেন এক জটাজুটধারী, সৌম্য-শান্ত সাধু মহারাজ। সঙ্গে এক যুবক চেলা। দুচার দিনের মধ্যেই ভিড় জমতে থাকলো সাধুর কাছে। কতজন আসে কত ইচ্ছা নিয়ে। কেউ আসে ধর্ম কথা শুনতে। কেউ আসে ভবিষ্যৎ জানতে। কেউ আসে কঠিন রোগের ওষুধ চাইতে। এমনি ধারা নানা ধরনের নানা লোকে বটতলা সর্বদা সরগরম।

একজন সেখানে এসেই বললো, “বাবা, ভীষণ মাথা ব্যথা করছে। অসহ্য যন্ত্রণা। আর সহ্য করতে পারছি না, বাবা।”

সাধু তার ঝোলা থেকে একটা বড়ি এনে তার হাতে দেয়। সে তার মুখে পোরে সেই বড়ি। সাধু তার কমণ্ডলু থেকে একটু জল ঢেলে দেয় তার মুখে। অল্প সময় কাটে। বেমালুম সেরে যায় মাথার যন্ত্রণা।

সাধুবাবার পায়ে পড়ে লোকটি বলে—“বাবা, আপনি সাক্ষাৎ ভগবান।”

“আমি ভগবান নই, বাবা। আমি ভগবানের এক সাধারণ সেবক। তবে হ্যাঁ, স্বয়ং ভগবান শিবশম্ভুর প্রত্যাদেশ পেয়েই আমি এখানে এসেছি। তিনিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে। কত রকমের আজব আজব সব রোগ হচ্ছে আজকাল। এসব রোগের নামও শোনা যায়নি এর আগে। এর কারণ কি জান? এর মূল কারণ হচ্ছে মদ্যপান। দিন দিন মদ খাওয়ার প্রচলন বাড়ছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসছে যত সব উৎকট উৎকট রোগ-ব্যাধি। মদ খাওয়ার ফলে লোকের পেটে জমছে ভয়ঙ্কর যত বিষ। এই বিষই হচ্ছে যত মাড়ক রোগের সহচর।

মানুষ যা কিছু খায় তা প্রথমেই যায় পেটের ভেতর। খাবার যখন পেটের ভেতরে ঢোকে তখন সেই খাবার গিয়ে প্রথমেই মেশে এই সব বিষের সঙ্গে। ফলে ঐ খাবার হয়ে পড়ে বিষাক্ত। তাই তো আজকাল এত সব নানা উৎকট রোগের ছড়াছড়ি।"—গুরুগম্ভীর গলায় সবার উদ্দেশ্যে বলেন সাধুবাবা।

সাধুকে ঘিরে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে রামের বন্ধু হলধরও উপস্থিত ছিল। সাধুর কথার প্রতিবাদ জানাতে সে বলে উঠলো, "এ কি বাজে কথা বলছেন, সাধু মহারাজ। মদ খেলেই অসুখ হয় এটা কি যুক্তির কথা হল? ঠাকুর দেবতারাও তো সোমরস খান। সোমরসও তো মদ। সেই মদ খেয়ে তাঁরা অমর থাকেন কেমন করে? জবাব দিন এবার।"

"দেবতাদের সোমরস আর তোমাদের মদ এক জিনিস নয়। আর মানুষ আর দেবতাও এক নয়। দেবতারা সর্বশক্তিমান। মানুষের শক্তি আর সাধ্য খুবই সীমাবদ্ধ। এসব কথা ভালভাবে মনে রেখো, বাবাসকল।" শান্ত গলায় বলেন সাধু মহারাজ।

"মদ না খেয়ে আমরা পারি না। কারখানায় কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আমাদের খাটতে হয় জানেন? অমানুষিক পরিশ্রম। এত খাটুনির পর একটু মদ না খেলে আমাদের শরীর চাঙ্গা হয় না। মনে স্ফূর্তি আসে না।" হলধর যুক্তি দেখায়।

"তবুও তোমার যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। যদি ধরেও নিই যে মদ খেলে স্ফূর্তি আসে। তবুও তো একটা কথা থেকেই যাচ্ছে। মদ খেয়ে অসুখে পড়লে কাজ কর্মের তো দফা রফা। তখন সংসারই বা চলে কী করে আর মদ খাওয়ার পয়সাই বা আসে কোথা থেকে? আর মদ খেলে অসুখ করবেই। প্রমাণ চাও তো হাতে হাতে প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি।"

কথা শেষ করেই সাধুবাবা কাছে ডেকে আনলেন সেই

লোকটিকে, যার মাথায় ব্যথা হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। সাধুবাবা ইঙ্গিত করতেই তার শিষ্য ঝোলা থেকে তার হাত বের করলো। শিষ্যের হাতে একটা সাধারণ ফুঁদেল। কমণ্ডলুর জল ঢেলে দিলেন সাধুবাবা ফুঁদেলের ভেতরে। তারপর একটা ন্যাকড়া দিয়ে ভাল ভাবে মুছে দিলেন ফুঁদেলের ভেতর বাহির। যার মাথায় ব্যথা হয়েছিল তাকে এবার সোজা দাঁড় করিয়ে তার পেটে ঠেকিয়ে শিষ্য এবার ধরলো ফুঁদেলটা। সাধুবাবা বললেন, "খুক্ খুক্ করে একটু কাশো তো, বাপু।"

লোকটি কাশলো। তার কাশির সঙ্গে তাল রেখে ফুঁদেলের নল দিয়ে গড়িয়ে পড়লো খানিকটা কুচকুচে কালো রঙের তরল জিনিস। এই আজব ব্যাপার দেখে তো থ হয়ে গেল উপস্থিত সবাই। কী অদ্ভুত কাণ্ডরে বাবা!

"যারাই মদ খায় তাদেরই পেটে জমে উঠেছে এই ভয়ঙ্কর বিষ। যারা এই বিষ পেট থেকে বের করাতে চায় তাদের পেট থেকে এই বিষ আমি বের করে দেব। তবে হ্যাঁ, বিষ ঝাড়ানোর পরে আর কেউ মদ খেতে পারবে না। ভগবান শিবশম্ভুর মূর্তি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।" ঘোষণা করে সাধু।

পরের দিন থেকে দলে দলে শ্রমিক আর চাষী এসে হাজির হতে থাকলো সাধুর কাছে। সাধুবাবা কারো কারো পেট থেকে বিষ ঝাড়লেন বটে কিন্তু বেশির ভাগ লোককেই একটা করে দৈব বড়ি খাইয়ে দিলেন যাতে পেটে জমা বিষ নষ্ট হয়। তবে সবাইকে দিয়েই শিব মূর্তি ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে তারা আর জীবনে মদ খাবে না। এমন কি মদ স্পর্শও করবে না তারা কোন দিন।

লোকের বিশ্বাস জমানোর জন্য সাধুর বিশ্বস্ত কিছু লোক গ্রাম থেকে এমন কিছু লোক নিয়ে এলো যারা জীবনে কখনো মদ খায় নি। সাধু নিজের হাতে তাদের পেটে ফুঁদেল লাগালেন। তারা খুক্ খুক্ করে কাশতে, ফুঁদেলের নল দিয়ে বেরুলো বর্ণবিহীন সাদা-মাঠা জল।

যারা ঐ সব লোকের বিষয়ে জানতো তারা সাধুর যুক্তি মেনে নিয়ে সবার কাছে দশ মুখে তার প্রশংসা করতে থাকলো।

সাধুর প্রতি ভক্তির বসে এক গ্রামবাসী তার ঠাকুর দালানে সাধুর থাকার জন্য একটা কামরা ছেড়ে দিল। সাধু আর তার চেলার আহারের জন্য দুধ, চাল, গুড়, ঘি, এসবও জোগাতো সে নিজের ইচ্ছায়। বাড়িতে সাধু মহাত্মার পায়ের ধুলো পড়লে সংসারের মঙ্গল হবে এই বিশ্বাসেই সে করে এই সাধুসেবা।

আসলে রূপেশই কিন্তু এসেছিল সাধুর নিখুঁত ছদ্মবেশ ধরে। তার যাদুর সহকারীকে সে সঙ্গে এনেছিল চেলার বেশে সাজিয়ে। আসার আগে রূপেশ আর একবার সেই ঝালাইয়ের মিস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিল। দেখা করে তার কাছে করে দেখিয়েছিল এই ফুঁদেল থেকে জল বের করার মজা। ঝালাইয়ের কারিগর ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে রূপেশকে নতুন করে বানিয়ে দিয়েছিল আর একটা ফুঁদেল। এই নতুন ফুঁদেলের গোপন ফোঁকড়টা এমন বড় মাপের বানিয়ে দিয়েছিল যে এতে অনেক বেশি পরিমাণ জল ভরে রেখে দিয়ে বেশ বেশি বেশি পরিমাণে বারে বারে বের করে দেখানো যেত। এই নতুন ফুঁদেলটাই রূপেশ সঙ্গে করে এনেছিল সোনাপুরে। এই নতুন ফুঁদেলটা দিয়েই সে করছিল এই সব কাণ্ডকারখানা। তার ওস্তাদ সহকারী ও তার সাফল্যের ব্যাপারে হয়েছিল অনেক দিক দিয়ে যোগ্য সহায়ক।

সাধুবাবার এই অদ্ভুত কাজের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সোনাপুরে এল এক অদ্ভুত পরিবর্তন। বহু পরিবারে শান্তি ফিরে আসতে থাকলো। মদের দোকানে বিক্রীবাট্টা প্রায় নেই বললেই চলে। যেসব পরিবারের প্রধান এতদিন মাইনের সব টাকা মদের দোকানে ঢেলে দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতো তারা সব মাইনের টাকা বাড়ি নিয়ে যেতে থাকলো। ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝি সবার মুখে হাসি ফিরে এলো।

সাধুর কথায় যারা মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল তাদের একজন হচ্ছে রাম দাস। সীতা চলে যাওয়াতে তার ঘর খালি হয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এতদিন সারাক্ষণ মদের নেশার ঘোরে থাকার ফলে সে বুঝতে পারে নি সীতা বা তার ছেলের অনুপস্থিতির ব্যাপারটা। মদ ছাড়ার পর ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারলো বৌ-ছেলে কাছে না থাকার বেদনা। বারে বারে সে দগ্ধ হতে থাকলো অনুশোচনার বেদনায়। মদের নেশা তাকে করে তুলেছিল পশু। নেশার বশে সে তার কর্তব্যে অবহেলা করেছে। বৌ-ছেলেকে খেতে পরতে দেয় নি। সে সীতার খোঁজ খবর করতে লাগলো।

রাম দাস সাধুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চায়—"বাবা, আমার বৌ-ছেলের খবর জেনে দিন। তাদের ছাড়া আমি থাকতে পারছি না।"

রূপেশের কাছ থেকে খবর পেয়ে হীরা দাস সীতা আর ভাগ্নেকে এনে রেখে যায় রাম দাসের কাছে। রাম দাসের সংসারে সুখের হাওয়া বইতে থাকে।

মদের দোকানী বেচারী পড়ে মহা ফাঁপরে। তার সব রাগ গিয়ে পড়ে সাধুর উপরে। এই সাধু বেটাই যত নষ্টের গোড়া। তার ফুলে ফেঁপে ওঠা সুন্দর ব্যবসা উঠে যাবার দাখিল হয়েছে এই বেটা সাধুরই জন্যে। এ বেটাকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে।

হলধরেরও মনে শান্তি নেই। সবাই এখন তাকে দেখে বিষ নজরে। সবার কাছেই সে এখন খারাপ। তার এত দিনের প্রভাব প্রতিপত্তি রাতারাতি চুপসে গেছে ফাটা বেলুনের মত। সেও সুযোগ খোঁজে সাধুকে উত্তম-মধ্যম দেবার।

একদিন সে মদের দোকানীকে চুপি চুপি বলল, "দাদা, ভাবছেন কেন? এই বেটা সাধুর দফা আমিই রফা করে দেব। আগে যে শহরে ছিলাম সেখানে এক বেটা আর এক বেটীকে খুন করে, রাতারাতি এখানে এসে নাম ভাঁড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে। দরকার

হয় তো এই বেটা সাধুকে আজ রাতে ওর আস্তানায় গিয়ে খুন করে রেখে পালিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে ভাই, এই নাও এক হাজার টাকা। আজ রাতেই নিকেশ করো সাধু বেটাকে। কাজ শেষ করলে আরো এক হাজার দোব।" এক তাড়া নোট দিয়ে বলে দোকানী।

"আজ রাত্তিরে বেটা যখন ঘুমোবে তখন ঘুমের মধ্যেই ওকে ছুরি মারবো।"

পাশের দোকানের এক কর্মচারী ছিল সাধুর ভক্ত। সে আড়াল থেকে শুনতে পেয়ে সব জানালো সাধুকে। গোপনে পুলিশকে জানানো হল। পুলিশ ফাঁদ পাতলো। সাধু তার বিছানার উপরে পোঁটলা-পুঁটলী সাজিয়ে রেখে তার উপর লম্বা করে চাদর ঢাকা দিল। দোর খোলা রেখে ঘরের বাইরে পুলিশের দলের সঙ্গে লুকিয়ে রইলো।

মাঝরাতে অন্ধকারে পা টিপে টিপে লম্বা ছোরা হাতে এলো হলধর। চাদর চাপা দেওয়া পোঁটলা-পুঁটলীকে সাধু মনে করে সে মারলো ছোরার ঘা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের বাঁশি বেজে উঠলো। জ্বলে উঠলো টর্চ। বড় দারোগা হলধরের হাতে পরিয়ে দিলেন হাতকড়া। ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে দারোগা সাহেব বললেন, "এই যে বাবা হলধর ওরফে কালাচাঁদ, ওরফে ছক্কু মিয়া। এসো এত দিন পরে তাহেরপুরের জোড়া খুনের মামলার আসল আসামী ধরা পড়লো।"

সাধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে দারোগা সাহেব দলবল নিয়ে এগিয়ে চললেন মদের দোকানীকে ধরতে। সাধুকে খুন করার জন্য দোকানী যে হলধরকে টাকা দিয়েছে তা ইতিমধ্যে ফাঁস করে ফেলেছে যে হলধর।

পুলিশের দল চলে যেতেই সাধুর ছদ্মবেশ খুলে ফেলে রূপেশ। তল্পীতল্পা গুটিয়ে নিয়ে সহকারী সহ বাড়ির দিকে ফিরে চলে সে। পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে তার মন। সোনাপুরের প্রতিটি সোনার সংসারে শান্তি ফিরিয়ে এনেছে তার ম্যাজিকের কৌশল।

ডিমের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ

ছোট্ট গ্রাম গীতাপুর। তার নাম জানার কথা নয় কারো। কিন্তু তবুও আশপাশে গ্রাম আর শহরের অনেকে জানে গীতাপুরের নাম। গীতাপুর গাঁয়ের চাষীদের ডিম পেলে আর কোনখানের ডিম রোচে না শহরের বাবুদের মুখে। অন্য জায়গার ডিমের চেয়ে গীতাপুরের ডিমের দামও তাই একটু বেশী। বাজারে পড়তে না পড়তেই কাটতি হয়ে যায় গীতাপুরের সব ডিম। গীতাপুরের ডিম বেচে শহরের মহাজনেরাও তাই খুব খুশি। মোটা রকমের দাদন দিতেও তাই পিছু পা হয় না শহর-গঞ্জের যত দোকানী-মহাজন।

গীতাপুরের ডিম-চাষীদের তাই আনন্দের শেষ নেই। তাদের সংসারে নেই অভাব। হেসে-খেলে, স্ফূর্তি করে আনন্দে কাটে তাদের দিন।

কিন্তু তাদের এই সুখের সাগরে ভাঁটা পড়লো। কোথা থেকে এলো এক সর্বনেশে রোগ। ছড়িয়ে পড়লো গাঁয়ের যত ডিম-চাষীর হাঁস-মুরগীর খোয়াড়ে খোয়াড়ে। বেশির ভাগ হাঁস-মুরগীই মারা পড়লো এই সর্বনেশে রোগে। ধুঁকতে ধুঁকতে যাও বা দু'চারটি হাঁস-মুরগী টিকে রইলো তারাও বন্ধ করলো ডিম দেওয়া।

বাজারে গীতাপুরের ডিম নেই। অন্য জায়গার ডিম কেনে লোকে। সেই স্বাদ সেই গন্ধ কোথায়? গীতাপুরের ডিমের স্বাদ যার মুখে একবার লেগেছে, অন্য ডিম তার ভাল লাগবে কেন? তেমন পুষ্টিও যোগায় না অন্য ডিম। এই হচ্ছে গীতাপুরের ডিমের ভক্ত বাবুদের ধারণা। সবাই খোঁজ খবর নেয় দোকানে দোকানে। গীতাপুরের ডিম আসছে না কেন। ব্যবসার ভবিষ্যৎ ভেবে গীতাপুরের লোকেরাও প্রকাশ করে না আসল রহস্য। এমনি করেই কাটে কিছু দিন। মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে গীতাপুরের ডিমচাষীর দল।

গীতাপুরেরই এক ডিমচাষী, নাম তার দীননাথ। সে একদিন সাথীদের বললো—"দেখ ভাই, আমার কিন্তু মনে হয় কোন ভূত-প্রেত, শয়তান-ডাইনীর নজর পড়েছে আমাদের গাঁয়ের উপর। তার ফলেই এই অলুক্ষুণে ব্যাপার ঘটেছে। এসো না একটা ভাল দেখে ওঝা নিয়ে এসে তুক্‌তাক করে 'গ্রাম বন্ধন' করিয়ে নিয়ে এই সর্বনাশের শেষ করে ফেলি।"

দীননাথের প্রস্তাব সবার মনে ধরে। সবাই মিলে চাঁদা তুলতে শুরু করে দিলো। ভিন গাঁ থেকে নিয়ে আসা হল এক ওস্তাদ, বিশ্বাসী গুণীনকে। চাঁদার টাকায় কেনা হল পূজার উপকরণ। মাথার লম্বা চুল এলো করে তাতে কয়েক মুঠো ধুলো ঘষে নিয়ে একটা মুড়ো ঝাঁটা হাতে করে উঠে দাঁড়ালো গুণীন। মন্ত্র পড়ে পড়ে সারা গাঁয়ে চক্কর দিয়ে এলো খালি পায়ে খালি গায়ে। পরনে থাকলো

শুধু একটা নতুন লাল গামছা। গলায় ঝুললো লম্বা রুদ্রাক্ষের মালা। গ্রামের সীমার চার কোণে মন্ত্র পড়ে, সে মারলো মুড়ো ঝাঁটার চার ঘা। তারপর সে বললো, "তোমাদের গাঁয়ে আসা অপদেবতাকে ঝাঁটা মেরে দূর করে দিয়েছি। 'গ্রাম বন্ধন' করে দিয়েছি। ও বেটা আর আসার সাহস করবে না।"

গুণীনের কথায় সবার মনে স্বস্তি আর ভরসা ফিরে এলো। চাঁদার টাকা থেকে মোটা দক্ষিণা আর নানা উপহার দিয়ে বিদায় করা হল গুণীনকে। নতুন আশায় বুক বেঁধে, নবীন উৎসাহে কাজ শুরু করলো গীতাপুরের ডিমচাষীর দল। নানা জায়গা থেকে নিয়ে এলো ভালো জাতের হাঁস-মুরগী। দূর-দূরান্তে পাড়ি জমালো অনেকে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গীতাপুরের নিজস্ব জাতের হাঁস-মুরগীর বংশধরের কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আসার জন্য। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের খালি খামার ভরে উঠলো নতুন হাঁস-মুরগীর বাচ্চাতে।

কিন্তু কোন লাভ হল না। দু চার দিন না যেতে যেতেই সেই সব নতুন আনা হাঁস-মুরগীর পালে আবার শুরু হল সেই পুরনো মহামারী। দলে দলে হাঁস-মুরগীর দল মরে শেষ হতে থাকলো আগেরই মত। এত খরচা করে, এত পরিশ্রম-ঝামেলা করে গুণীন আনা হল। কোন কাজ হল না। পয়সাগুলো সব জলে গেল অহেতুক। হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো ডিমচাষীর দল। তাঁদের জমানো টাকায়ও টান পড়েছে এত দিনে।

কপালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে দীননাথ বলে, "ভাইসব, আমাদের কপালে সুখ লেখেন নি ভগবান। ডিম বেচে দুটো কাঁচা পয়সা পাচ্ছিলাম আমরা এই গ্রামের মানুষেরা। ভগবান তা আর চাইছেন না। মুখে ছাই তোর এই ডিম বেচে উপুরি রোজগারের। লাঙ্গল ঠেলেই শুধু দিন যাবে এখন আমাদের। ডিমের কারবারের এইখানেই ইতি দাও।"

এবারও দীননাথের কথা মনে ধরে সবার। "ঠিক বলেছ ভাই,

ভগবান চান না যে আমরা ডিমের চাষ করে দু পয়সা উপুরি কামাই। ভগবানের মার ভাই, ভগবানের মার। এ মার থেকে পার পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।" মন্তব্য করে একজন বয়স্ক গ্রামবাসী।

ডিমের চাষে জলাঞ্জলি দিয়ে গীতাপুরের লোকেরা মনপ্রাণ ঢেলে দেয় তাদের সনাতন লাঙ্গল ঠেলার কাজে। এতদিন এর সঙ্গে ছিল ডিমের চাষ। এবার তা পুরোপুরি শিকেয় ওঠে। জমি চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলতো হাঁস-মুরগী পালার কাজ। এখন চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে চলে দলাদলি, পরচর্চা, পরনিন্দা, নেশা-ভাঙ্গ আর নানা অকাজ-কুকাজ। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের পরিস্থিতি আর পরিবেশ পাল্‌টে যায় রীতিমত। গীতাপুর গাঁয়ের সে শ্রী আর থাকে না।

গীতাপুরের জমিদারের ছেলে শঙ্কর শহরে থেকে কলেজে পড়ে। সেবার ছুটিতে সে আবার এলো গ্রামে। আগের ছুটিতে যখন সে গ্রামে এসেছিল তখন তার মা প্রত্যেক বেলাই একটা না একটা ডিমের রকমারী তরকারী রান্না করে খাওয়াতেন। খুব ভাল লাগতো তার ঐসব সুন্দর সুন্দর ডিমের রান্না। এবার পর পর দুদিন পার হয়ে গেল কিন্তু একটিও ডিমের পদ তার পাতে পড়লো না দেখে অবাক হল শঙ্কর।

মাকে জিজ্ঞাসা করলো সে, "কী হল মা, তুমি কি ডিম রান্না করা ভুলে গেলে না কি? গতবার তো প্রতি বেলাতেই একটা না একটা ডিমের পদ রান্না করে খাইয়েছিলে। এবার কী হল ডিমের? আ! এখনো মুখে লেগে রয়েছে সেই ডিমের কালিয়ার স্বাদ।"

"আর বলিস নে, বাবা। আর কি ডিম পাওয়া যায় গীতাপুরে? সব হাঁস-মুরগী মরে শেষ হয়ে গেছে। গীতাপুরের চাষীরা আর হাঁস-মুরগী পোষে না এখন। শুধু মাঠের চাষ-আবাদ নিয়েই আছে তারা। ডিমের কাজ কারবার উঠিয়ে দিয়েছে ওরা।"

শুনে খুব দুঃখ পেলো শঙ্কর। গরীব চাষীরা ডিম বেচে বেশ

ভাল রকম বাড়তি আয় করছিল। হাল ফিরেছিল তাদের অভাবের সংসারের। হঠাৎ কেন এই দুর্গতি হল বেচারীদের? ব্যাপারটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখতেই হবে; মনে মনে ভাবে শঙ্কর।

অল্প একটু খোঁজ খবর করতেই শঙ্কর বুঝতে পারলো যে কোন ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপেই মরেছে যত হাঁস-মুরগী। রোগের প্রতিকার আর প্রতিরোধের ভাল ব্যবস্থা করতে পারলেই হাঁস-মুরগীর মহামারী ঠেকানো যেতো। অন্ধ কুসংস্কারের দাস নিরক্ষর এই গাঁয়ের লোক। এই সব কথা এরা জানবেই বা কোত্থেকে আর বোঝালেই বা বুঝবে কেন!

দীননাথের সঙ্গে একদিন গাঁয়ের পথে দেখা হল শঙ্করের, শঙ্কর বলল, "কি দীননাথ দা, কেমন আছ?"

"আপনাদের আশীর্বাদে এক রকম চলছে, ছোটবাবু। আপনি ভাল আছেন তো?"

"হ্যাঁ ভাই, ভালই আছি। তবে তোমাদের ডিমের কারবার বন্ধ করার খবর শুনে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে।"

"তা আর কী করা যাবে ছোটবাবু। বিধি বাম। ভগবান চান না যে, আমরা হাঁস-মুরগীর চাষ করে বাড়তি দুটো পয়সা কামাই করে ছেলে-মেয়ে-বৌ নিয়ে সুখে থাকি। এতদিন কেবল জমিতে চাষ-আবাদ করে আধ-পেটা থেকে যেমন করে দিন কাটাচ্ছিলাম, তেমনি ভাবেই দিন চলুক আমাদের। তাই ভগবানের ইচ্ছা। তাই তিনি আমাদের হাঁস-মুরগী বারে বারে মেরে ফেলে আমাদের ডিমের কারবার রুখে দিচ্ছেন। তেনার ইচ্ছের বাইরে কি কোন কাজ হয়? আপনি তো শিক্ষিত মনিষ্যি। আপনিই বলুন। তিনি বাধা দিলে, কারো কি সাধ্যি আছে সে কাজ করে? ভিন গাঁ থেকে গুণীন নিয়ে এসে অপদেবতা তাড়ালাম। কত টাকা খরচা করলাম। 'গ্রাম-বন্ধন' করালাম। গুণীনের কথামতন এত পয়সা খরচা করে নানা জায়গা

থেকে নিয়ে এলাম হাঁস-মুরগীর ছানা। নতুন করে কারবার শুরু করতে গেলাম। কিন্তু পারলাম কি? তেনার কোপে সব কিছু ভেস্তে গেল। ভণ্ডুল হয়ে গেল আমাদের এত যত্ন-আয়োজন। আগেরই মতন একটা একটা করে হাঁস, একটা একটা করে মুরগী ধড়ফড় করে মরে যেতে থাকলো। আমাদের সব পরিশ্রম, সব চেষ্টা বেকার হল। ভগবানের মারের সঙ্গে কি আর মানুষ পারে? তাই তো ডিমের কারবারে চিরদিনের জন্য লালবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে শুধু লাঙল সার করেছি।"

শঙ্কর বুঝতে পারে দীননাথ আর গ্রামবাসীদের কুসংস্কার আর হতাশার কথা। তবুও কোন মন্তব্য করে না সে। কোন যুক্তি বা সদুপদেশে কোন কাজ হবে না। অন্ধ সংস্কারের শিকার এরা। এদের ভালো পথে আনতে হলে সে পথ শুরু করতে হবে তাদেরই বিশ্বাসে বাঁধা পথ থেকে। "আবার দেখা হবে" বলে সে বিদায় নেয় দীননাথের কাছ থেকে।

বাড়ি ফিরে এসে সে গভীরভাবে চিন্তা করে এই ব্যাপারটা নিয়ে। প্রথমে জানতে হবে হাঁস-মুরগীর মারাত্মক কী রোগ হতে পারে তার সঠিক বিবরণ। তারপরে জানতে হবে তার প্রতিকার করার আর প্রতিবিধান করার উপায়। তারপর জানতে হবে হাঁস-মুরগীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার মূলতথ্য। এসব জানতে হলে যেতে হবে শহরে। দেখা করতে হবে পশু-পাখি চিকিৎসকের সঙ্গে। নিতে হবে তাঁদের পরামর্শ আর বিধি-বিধান।

দুদিন পরেই শঙ্কর চলে গেল শহরে। শহরে গিয়ে হাঁস-মুরগী প্রতিপালন আর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে পড়াশোনা করলো। বই কিনলো গোটা কয়েক। যোগাযোগ করলো পশু ডাক্তারের সঙ্গে। হাঁস-মুরগীকে ইনজেকসন দেওয়া, হাঁস-মুরগীর পরিচর্যা আর শুশ্রূষা করা ইত্যাদি ব্যাপারও শিখে নিলো। দরকারী ওষুধ-পত্রও কিনে ফেললো কিছু। এর পর প্রস্তুত হয়ে সে ফিরে এলো গীতাপুরে।

সরল, বিশ্বাসী, কুসংস্কার-পীড়িত গাঁয়ের চাষাভুষা লোক। জ্ঞান-যুক্তির উপদেশে কাজ হওয়া সহজ নয়। এমন কোন পথ দিয়ে এগুতে হবে যা গাঁয়ের লোকে সরল মনে বিশ্বাস করতে পারে। শঙ্করের শখ ছিল ম্যাজিকে। তার এক সহপাঠীও ছিল ম্যাজিকবিলাসী। শঙ্কর ঠিক করলো ম্যাজিকের প্যাচেই সে কিস্তিমাৎ করবে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। সে ঠিক করলো, সব গ্রামবাসীকে এক সঙ্গে এক জায়গায় জড়ো করে তাদের সামনে এমন এক অলৌকিক ঘটনা দেখাবে যাতে তার প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মে।

শঙ্করের কথা মতন এক দিন বিকালে দীননাথের বাড়িতে এসে জড়ো হল গাঁয়ের মাতব্বরেরা। তাঁদের উদ্দেশ্যে শঙ্কর বললো, "এটা খুবই দুঃখের কথা যে, আমাদের গীতাপুর গাঁয়ে আর ডিমের চাষ হচ্ছে না। গীতাপুরের ডিমের জুড়ি মেলা ভার ছিল এই সেদিন অবধি। আজ? ভগবানের অভিশাপে আর হাঁস-মুরগী বাঁচে না গীতাপুর গাঁয়ে! চাষী ভাইদের বাড়তি রোজগার বন্ধ হয়েছে এর ফলে। ঘরে ঘরে অভাব। ঘরে ঘরে অনটন। ঘরে ঘরে অশান্তি। গীতাপুরের ঘরে ঘরে মাঝখানে যে লক্ষ্মী-শ্রী ফিরে এসেছিল তা আর নেই। আমিও তো এই গীতাপুর গাঁয়েরই ছেলে। গীতাপুরের লোকের দুঃখ দেখলে আমার কষ্ট হয়। গীতাপুরের লোকের সুখ দেখলে আমার হয় সুখ।"

শঙ্কর থামতেই দীননাথ বললো, "যথার্থ বলেছ ছোটবাবু। তুমি তো আমাদেরই একজন গো। আমাদের সুখ-দুঃখই তো তোমার সুখ-দুঃখ।"

"তাই তো সেদিন শহরের এক যোগী মহাত্মাকে বলেছিলাম গীতাপুরের দুঃখের কাহিনী। বলেছিলাম হাঁস-মুরগী মরে যাবার কথা। তিনি খড়ি দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে কি সব হিসাব-টিসাব করে দেখলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—সব ঠিক হয়ে গেছে। খারাপ সময় কেটে গেছে গীতাপুরের। এখন সেখানে

মাঠে মাঠে সোনা ফলবে। আরো অনেক ভালো ভালো ডিম দেবে হাঁস-মুরগী। গাছে আরো ভাল ফল ফলবে। গরু-মোষের দুধ হবে আরো ঘন। আরো মিষ্টি।"

চোখ বড় বড় করে পরম আগ্রহে দীননাথ আর গ্রামবাসীরা শোনে শঙ্করের কথা। তাদের আগ্রহ দেখে শঙ্কর বলে চলে—"যোগীবাবা খুশি হয়ে আমার হাতে একটা বিশেষ কবচ পাঠিয়েছেন গীতাপুরের মঙ্গলের জন্য। হাঁস-মুরগীকে ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে এ কবচের ক্ষমতা অসাধারণ। বিশেষ করে ডিমের উন্নতির ব্যাপারে এ কবচের কেরামতি তো তিনি নিজেই চোখের সামনে দেখালেন আমাকে। কাণ্ডকারখানা দেখে তো আমি আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। একি কাণ্ড রে বাবা! ব্যাপার দেখে তো আমার মনে হচ্ছিল যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি আমি। তিনি আমাকে একটা মন্তরও শিখিয়ে দিয়েছেন ডিমের জন্য। চাও তো এখুনি আমি তোমাদের দেখাতে পারি ডিমের উপরে এই কবচের প্রভাবটা কেমন।"

সবাই নড়েচড়ে বসে শঙ্করের কথা শুনে। শঙ্কর প্রস্তুত হতে থাকে। পকেট থেকে একটা ঘন নীল রঙের রুমাল বের করে এনে শঙ্কর তা পাতে তার ছড়ানো বাঁ হাতের তেলোর উপরে। তার বাঁ হাতটা সে এমন ভাবে একটু উঁচিয়ে রাখে যাতে এই হাতের আঙ্গুলের দিকটা উপরের দিকে থাকে। কব্জির কাছটা একটু পেছন দিকে ভাঁজ করা থাকায় এই হাতের চেটোর উপরের সবটাই ওদের সবার নজরে পড়তে থাকে বেশ ভালভাবে। এরপর অন্য পকেট থেকে শঙ্কর বের করে একটা বড়-সড় হাঁসের ডিম। এই ডিমটা সবার সামনে সে রাখে বাঁ হাতের তেলোর উপরে। তারপর রুমালের একধারের বাড়তি অংশটা টেনে সে চাপা দেয় ডিমটাকে আর বলে—"এই দেখুন সেই কবচ। এখন এই কবচের কেরামতি দেখার জন্য আমি এটাকে ঐ ডিমের সঙ্গে রেখে মন্তর পড়ছি।"

কথা শেষ করে মুখে বিড় বিড় করে মন্তর উচ্চারণ করে করে শঙ্কর পকেট থেকে একটা পিতলের মাতুলী বের করে ডান হাতে ধরে রুমালের ঢাকনার তলায় হাত বোলায়। অল্প পরেই মাতুলী সরিয়ে এনে সে তা দেয় দীননাথের হাতে। দীননাথ তার মাথার উপরে রেখে হাত চাপা দেয় সেই মাতুলীর উপরে।

"এবার দেখা যাক কী হল।" শঙ্কর আস্তে আস্তে রুমালের ভাঁজ খোলে। কাণ্ড দেখে ছানা বড়া হয়ে যায় সবার চোখ। কবচের গুণে একটা ডিম বেড়ে তুটো হয়ে গেছে। ঘন নীল রুমালের পটভূমির উপরে একটা ডিমের পাশে বিরাজ করছে আর একটা ডিম। মিনিট তুয়েক হাত উঁচু করে এমনিভাবে যুগল ডিম দেখানোর পর শঙ্কর রুমালটাকে ভাঁজ করে গুটিয়ে নেয়। তারপর রুমালের সঙ্গে ঐ ডিম যুগলও চলে যায় তার পকেটে।

শঙ্কর ধ্বনি দেয়—"জয় বাবা যোগীবাবার জয়!"

সকলে মিলে প্রতিধ্বনি তোলে—"জয় বাবা যোগীবাবার জয়।"

গ্রামবাসীদের মনে জাগে এক নতুন কর্মপ্রেরণা। নতুন উদ্যমে তারা নেমে পড়ে কাজে। শঙ্কর হাত মেলায় তাদের সঙ্গে। প্রথমেই শঙ্কর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করায় হাঁসমুরগীর পুরানো ঘরগুলো। ওষুধ ছিটিয়ে রোগের বিষ দূর করে। তারপর নানা জায়গা থেকে বাছাই করে করে সুস্থ নীরোগ হাঁস-মুরগীর ছানা জোগাড় করে এনে তাদের প্রথমেই দেয় রোগ প্রতিষেধক টীকা। বৈজ্ঞানিক প্রথায় খাওয়ায় ছানাদের। নিয়মিত চলে সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ। তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে ছানারা। শঙ্কর নিজের বাড়িতেও বসায় এক খামার। এই খামারের ভার সে দেয় তার এক খুড়তুতো ভাইকে। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত এ ভাই। সহজেই সে বুঝে নেয় সব কিছু। বই পড়েও তার অনেক জ্ঞান বাড়ে। কোন্ রোগের কী লক্ষণ। কোন্ রোগের কী চিকিৎসা। সবই শঙ্কর বলে দেয় তার ভাইকে।

দীননাথসহ গীতাপুরের সব চাষীই সুখী। সবাই খুশি শঙ্করের

উপরে। শঙ্করের কথা মতন দীননাথ সেই কবচটা পুঁতে দিয়েছে গ্রামের ঠিক মাঝখানে। চৌমাথার মাটির তলায় অবস্থান করে কবচ এখন গ্রামের সুরক্ষায় ব্যস্ত।

ছুটি ফুরিয়ে যেতে শহরে ফিরে যাবার উদ্যোগ করে শঙ্কর। একদিন দুপুরে তার ভাই এসে খুব করে ধরে বসলো শঙ্করকে—"সব কায়দা কৌশলই তো শেখালে ভাই, ঐ ডিম বাড়ানোর মন্তর এবার শিখিয়ে না দিলে কিন্তু ছাড়ছি না।"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেউ কোথাও আছে কিনা দেখে নিয়ে শঙ্কর বলে—"আরে দাদা, মন্তর কোথায়? সবই তো ভাঁওতাবাজি। একটা সহজ ম্যাজিকের চটকা চটক মাত্র। যাও তো দেখি দুটো ডিম নিয়ে এসো। একটা বড় আর একটা তার চেয়ে অল্প ছোট।"

ভাই ডিম নিয়ে আসতে শঙ্কর বড় ডিমটার একধারের দেওয়ালের মাঝখানে ফুটো করে তার ভেতরের সব লালা বের করে ফেলে। তার পরে সেই লালাহীন খোলাটাকে ভাল করে ধুয়ে সাফ করে শুকিয়ে নেয়। তারপর লম্বালম্বি ভাবে এই খোলাটাকে সাবধানে এমনভাবে কেটে নেয় যাতে এর একটা আধখানা-খোলার মধ্যে ছোট ডিমটাকে ঢোকানো যায়। লালা বের করার জন্য করা ফুটোটা যে আধখানা খোলায় থাকে সেটা কিন্তু নেয় না সে।

এরপর পকেট থেকে রুমাল বের করে তার বাঁ হাতের চেটোর উপরে বিছিয়ে নেয় শঙ্কর। তুলে নেয় ডান হাতে সেই বানানো যুগল ডিম। বড় ডিমের আধা খোলের দিকটা থাকে সামনের দিকে। তার ভাই সামনে বসে থাকায় তার মনে হয় যেন শঙ্কর একটা গোটা ডিমই রাখছে রুমালের উপরে। পেছন দিকটা দেখলেই সে গোপন রহস্য দেখতে পেতো। এর পর রুমালে ঢাকা দিয়ে শঙ্কর হাত ঢোকালো রুমালের তলায়। অল্প পরেই রুমালের ঢাকনা সরালো শঙ্কর। দেখা গেল বড় ডিমের পাশে আর একটা ডিম।

"রুমালের আড়ালে খোলশটা তুলে রেখেছি ডিমের পাশে। বুঝেছ তো ব্যাপারটা?" কথা শেষ করে হেসে উঠলো শঙ্কর। তার ভাইও উঠলো হেসে।

ভুল বোঝাবুঝি

বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে বউখেকো। এর কারণও আছে। পর পর দু'বার বিয়ে করেছেন রাজা জয়ভদ্র। দুই দুই বারই বউ মারা গেছে তাঁর। এক বছরও টেকেনি কোন বউ। হয়নি কোনও ছেলেমেয়ে। এত বড় রাজ্য! রাজা একা। কেমন যেন বেমানান লাগে। রাজারও লাগে বড় একলা একলা। তাই কপাল ঠুকে রাজা জয়ভদ্র আবার বিয়ে করবেন বলে ঠিক করলেন। এবার রানী হয়ে এলেন রাজকুমারী তারাবতী। যেমন তার রূপ, তেমনই তার ব্যবহার। আর গুণ? তারাবতীর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। নাচ-গান-ছবি আঁকা ছাড়া আরো অনেক কলাশাস্ত্রে তিনি অনন্যা।

প্রাসাদে তারাবতীর পা পড়তেই যেন লক্ষ্মীশ্রী ফিরে এলো চার-দিকে। পরপর দুই রানী মারা যাবার পর এসেছেন নতুন রূপবতী, গুণবতী রানী। তাঁর আদরের শেষ নেই। রাজা এক দণ্ডের জন্যও কাছছাড়া করতে চান না রানী তারাবতীকে। জয়ভদ্রের সব সময়ের সঙ্গিনী হয়ে থাকেন তারাবতী। রাজা যাবেন প্রমোদ বিহারে তো রানী যাবেন তাঁর সঙ্গে। রাজা যাবেন শিকারে তো সেখানেও রানী তারাবতীকে হতে হবে তাঁর সঙ্গিনী।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজা জয়ভদ্র রানী তারাবতীকে কাছে ডেকে বললেন, "দেখ, মাস তিনেক আগে আমরা গিয়েছিলাম হিরণ্যক বনে। মনে আছে তোমার?"

মাথা দুলিয়ে তারাবতী বলেন, "তা আর মনে নেই? এমন সুন্দর বন আমি জীবনে দেখিনি। চন্দন গাছের কি সমারোহ।

কত ফুল। কত পাখি। বহু বিচিত্র প্রজাপতির ছড়াছড়ি। আর সেই জোর-ঝরণাটা? যার একধারে ঝরছে উষ্ণজল আর অন্যধারে শীতল, সুবাসিত, সুমিষ্টজল? আর ঐ যে বিশাল সুন্দর হ্রদটা, যার পাড়ে আমাদের রাজ-তাঁবু খাটানো হয়? একি আর ভোলা যায়?"

"সেই বনে আবার যাব বলে ঠিক করেছি মৃগয়া করতে। তুমি তো আবার মৃগয়া পছন্দ করো না। তা হলে বরং নিরীহ প্রাণীদের তীর বিদ্ধ করবো না। তাদের ফাঁদে ফেলে ধরে আনবো তোমার প্রাসাদ উদ্যানের জন্য। হিংস্র পশুর থেকে প্রাণ বাঁচাতে হলেই শুধু অস্ত্র চালানোর দরকার হবে। তুমি যাবে তো? এবার কিন্তু দিন কতক বসবাস করবো ঐ বনে।" রাজা নরম গলায় বলেন রানীকে।

আনন্দে নেচে উঠলো রানীর মন। ঠিক করলেন এবার ঐ বনে বসে কতকগুলো দৃশ্যের ছবি আঁকবেন তিনি। ঠিক কতদিন বনে থাকা হবে রাজার কাছ থেকে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন তিনি। কতদিন বাইরে থাকতে হবে তা না জানলে কেমন করে তিনি ঠিক করবেন কয় প্রস্থ পোশাক-আসাক সঙ্গে নেবেন। দরবার থেকে রাজা কখন ফেরেন তাঁর প্রতীক্ষা করতে থাকেন রানী।

অন্যান্য দিন ফাঁক পেলেই জয়ভদ্র দরবার থেকে ছুটে এসে একবার দেখে যান রানীকে। খাবার জন্য তো দুপুরে একবার আসেনই তারাবতীর মহলে। দুপুরের খাওয়ার পর বিশ্রাম। তাও তো তিনি করেন রানীরই সঙ্গে। কিন্তু আজ কী হল দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল তবুও রাজা এলেন না। উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে আছেন রানী তারাবতী। কী হল রাজার! রাজার খবর নিতে দাসীকে পাঠান তিনি। "রাজা মশাই ব্যস্ত"—ফিরে এসে সংক্ষেপে জানায় দাসী। চারবার খবর নিতে লোক পাঠিয়ে তারাবতী একই খবর পান—"রাজামশাই ব্যস্ত।"

ব্যাপার বুঝতে পারেন না রানী। যে তারাবতীকে কিছুক্ষণ না দেখতে পেলে হাঁপিয়ে ওঠেন রাজা জয়ভদ্র, তাঁরই প্রতি এই

অবহেলা কেন দেখাচ্ছেন তিনি এখন। এই তো সকাল বেলাও তো তিনি কত সোহাগভরে তাঁর কাছে বললেন হিরণ্যক বনে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা। অবাক হন রানী তারাবতী। রাজার মেয়ে তিনি। রাজাদের হঠাৎ হঠাৎ কর্মব্যস্ততার কথা তাঁর অজানা নয়। তিনি ভাবেন হয় তো কোন জরুরী ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজনে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রাজা। কাজের চাপ কমলেই এসে পড়বেন। রাজার আসার পথ চেয়ে প্রহর গুনলেন রানী তারাবতী।

জেগে জেগে রাতের প্রহর গুণেন রানী রাজার পথ চেয়ে। রাতের সব প্রহর পার হয়ে যায়। রাজা আসেন না তারাবতীর মহলে। তারাবতী ভেবেছিলেন বুঝি রাজা যাবার আগে মন্ত্রীপাত্র-মিত্রদের রাজকার্য বুজিয়ে দিচ্ছেন। যাতে তিনি যে কয়দিন বনে থাকবেন সে কয়দিন তাঁরা কাজ চালিয়ে নিতে পারেন রাজার অনুপস্থিতিতে।

সকাল বেলায় যখন তারাবতী জানতে পারলেন যে, তাঁকে সঙ্গে না নিয়ে রাজা দলবল নিয়ে চলে গেছেন হিরণ্যক বনের পথে তখন তাঁর বিস্ময় আর অভিমানের বাঁধ ভেঙে গেল। যখন তিনি আরও শুনলেন যে যাবার আগে রাজা আদেশ দিয়ে গেছেন যে তাঁকে যেন তাঁর রানীমহলে বন্দিনীর মত কড়া পাহারায় রাখা হয়, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভেঙে পড়লেন অশ্রুর প্লাবনে। তাঁর প্রতি তাঁর রাজা তাঁর প্রিয়তম জয়ভদ্র হঠাৎ এত রূঢ়, এত নির্দয় হয়ে পড়লেন কেন? কী এমন অপরাধ তিনি করেছেন?

এদিক ওদিক ঘুরে দেখেন রানী তারাবতী। তাঁর মহলের চার-দিকে। আশেপাশে কোণায় কোণায় গিজগিজ করছে সশস্ত্র খোঁজা প্রহরী আর নারী রক্ষিণীর দল। অপমানে-অভিমানে বুক ভেঙে আসে তাঁর। যে রাজাকে এত ভালবেসে এসেছেন তিনি এতদিন। যে রাজাকে দিনের পর দিন তিনি জ্ঞান করেছেন তাঁর জীবন-সর্বস্ব

বলে তিনিই তাঁর প্রতি দিয়েছেন এই চরম অপমানকর বিধান এই লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

স্থির হয়ে বসে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করতে থাকেন তিনি ঠাণ্ডা মাথায়। কোনদিন কোন সময়ে কোন অসতর্ক মুহূর্তেও তো রাজা তাঁর প্রতি এতদিন এমন কোনও আচরণ করেননি যাতে তাঁর প্রতি রাজার সামান্যতম দরদ, সোহাগ, আদর বা ভালবাসার অভাব প্রকাশ পেয়েছে। গতকালের সকালেও তো তিনি তার প্রতি কত মধুর ব্যবহার করলেন। কী এমন ঘটনা ঘটলো তারপরে যার জন্য রাজা এত বিরক্ত, এত অকরুণ হয়ে উঠলেন তাঁর আদরের রানী তারাবতীর উপর?

কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, উপোস করে পড়ে থাকেন রাজা জয়ভদ্রের সোহাগিনী রানী তারাবতী। রানীর সময়টা খুবই খারাপ। তাই যদি না হবে তবে তাঁর সবচেয়ে আদরের, সবচেয়ে কাছের অন্তরঙ্গ দাসী কুমারীও রানীর এই অসময়ে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবে কেন? কুমারী কাছে থাকলে অন্ততঃ দুটো কথা বলে বাঁচতেন রানী। কুমারীও তাঁকে শোনাতে পারতো কিছু। কিছু শান্ত্বনা দিতে পারতো সে তারাবতীকে। তাঁকে সেবা-যত্ন করে তাঁর মন ভাল করে তুলতে পারতো সে।

যেদিন সকালে রাজা জয়ভদ্র তারাবতীর কাছে বলেছিলেন হিরণ্যক বনে যাবার কথা সেই দিনই সন্ধ্যায় খবর এসেছিল যে কুমারীর বাবা মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে। তাই শুনে রানী তারাবতী কুমারীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার বাপকে শেষ দেখা দেখতে। বাপ মারা যেতে তার ফিরে আসতে দুদিন দেরি হয়ে যায়। ফিরে আসার পর রানীমহলের হাল দেখে অবাক হয়ে যায় কুমারী। রানীর দুর্দশা দেখে তার দুচোখ ফেটে জল বেরুতে থাকে। রানী তারাবতীকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে কুমারী। রানীও কুমারীকে

ভালবাসেন খুব তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিশ্বস্ততা আর সুন্দর কাজের জন্য। কুমারী তাঁর সমবয়সী সখীরই মত। তারাবতীর পায়ের কাছে বসে কুমারী শোনে সব কথা। তার অনুপস্থিতির সময় কী কী ঘটেছে সব শুনে থ হয়ে যায় কুমারী।

"তোর বাবার খবর বল, কুমারী।" প্রশ্ন করেন রানী।

"বাবা গত হয়েছেন, রানীমা। বুড়ো হয়েছিলেন। মুক্তি পেয়েছেন। দুঃখ নেই আমার। তবে শেষ সময়ে তাঁর মুখে যে আমার নিজের হাতে একটু জল দিতে পেরেছি এতেই আমার শান্তি। রানী-মা আপনার দয়াতেই আমার পক্ষে এটা করা সম্ভব হয়েছে। ভাগ্যিস আপনি বুদ্ধি করে সেদিন রাতে আমাকে প্রাসাদ থেকে বাইরে যাবার পথ করে দিয়েছিলেন। সকাল হবার জন্য অপেক্ষা করলে আর বাবাকে দেখতে পেতাম না। এই দয়ার জন্য আমি চিরকালের জন্য ঋণী হয়ে থাকবো, রানী-মা।" সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে পরিচারিকা কুমারী।

"আমার দূরদৃষ্টের কথা শুনেছিস তো? ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। কী এমন অপরাধ করেছি যে মহারাজ হঠাৎ এত বিরূপ হয়ে উঠলেন আমার প্রতি? এর গোপন কথাটা জানতেই হবে আমাকে। রাজা ফেরা মাত্র তাঁর হাতে আমার একটা চিঠি দিয়ে আসতে পারবি?"

"আমি আপনার দাসীর দাসী, রানী-মা। এইভাবে জিজ্ঞাসা করে আমাকে কেন পাপের ভাগী করছেন, লক্ষ্মী রানীমা? মহারাজা আসামাত্র আপনার এই দাসী তাঁর হাতে আপনার চিঠি তুলে দিয়ে ধন্য হবে।"

ঠিক সেই দিনই রাজা হিরণ্যক বন থেকে ফিরে এলেন। বনেও তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। এক অসহনীয় যন্ত্রণায় নিরত জ্বলছিল তাঁর মন।

রাজা ফিরে আসামাত্র কুমারী গিয়ে দেখা করে তাঁর সঙ্গে।

তাঁর হাতে তুলে দেয় রানী তারাবতীর চিঠি। চিঠিতে রানী সবিনয়ে জানতে চেয়েছেন তাঁর প্রকৃত অপরাধটা কী।

চিঠি পড়েই পাগলের মত রাগে ফেটে পড়েন রাজা। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন—

"তারাবতী অসতী। সে ব্যভিচারিণী। সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে পরপুরুষের প্রতি অনুরক্তা। মৃত্যুই তার উপযুক্ত শাস্তি। সে কি জানে না কী পাপ কাজ সে করেছে? স্বামীকে প্রতারণা করা! তার বিশ্বাসের অপমান করা যে মহাপাপ তা সে জানে না?"

মর্মাহত হল কুমারী। তবুও বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলো সে, "মহারাজ, আপনি সকলের রক্ষক। আপনি দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। সুবিচারক বলে দশ দিকে আপনার খ্যাতি। আপনার বিচারে রানীমার যে যোগ্য দণ্ড তা তো তাঁকে অবশ্যই দেবেন আপনি। কিন্তু তার আগে একবার রানীমার যা বলার আছে তা একবার শুনলে হত না? তিনি অধীর হয়ে আপনার প্রতীক্ষা করছেন। একবার দেখা দেবেন না তাঁকে?"

"ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যায় যাব তার মহলে। বেশিক্ষণ সময় দিতে পারবো না কিন্তু। আগেই জানিয়ে রেখো তাঁকে।"

অন্যান্য পরিচারিকাদের কাছে নানাভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিতে নিতে একটা আজব তথ্য সংগ্রহ করে ফেললো কুমারী। যে সন্ধ্যায় তার বাবার অসুখের খবর আসে সেই দিনই সারাদিনের অন্তহীন ব্যস্ততার শেষে মহারাজা একাকী সন্ধ্যারাত্রে আসছিলেন রানী তারাবতীর মহলের দিকে। হঠাৎ কেন যেন মাঝপথে বাগানের মধ্যে তাঁর গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। ক্ষণিক নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি হঠাৎ মুখ ফেরালেন নিজের খাশমহলের দিকে। তারপর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে গিয়ে ঢুকলেন তাঁর খাশমহলের খাশকামরায়।

এই বিশেষ ঘটনার স্থান-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সঠিক পরিমাপ করবার জন্য এক জায়গায় নিরিবিলি স্থির হয়ে বসলো কুমারী। খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর তার মুখে ফুটে উঠলো এক রহস্যের সূক্ষ্ম হাসি। পরিস্থিতির মূল রহস্যের গোড়া হয় তো বা তার নজরে পড়েছে। মহারাজার মনে তারাবতীর প্রতি কেন অবিশ্বাস জন্মেছে তার কারণ বোধহয় তার বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে।

আর দেরি না করে কুমারী পড়ি কি মরি করে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে হাজির হয় তারাবতীর সামনে। সে রানীকে বলে, রাজা তাঁর সতীত্ব বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই কুমারী রানীর কাছে বিস্তারিতভাবে খুলে বলে তার খোঁজখবরের ফলাফলের কথা। তারপর সে রানীর কাছে প্রকাশ করে তার সিদ্ধান্ত আর ধারণার সব কথা।

সব শুনে এতদিন পরে তারাবতীর মুখে হাসি ফোটে। এ হাসি আগেকার মত তেমন স্বচ্ছ অনির্মল নয়। এতে যেন থাকে কিছুটা অভিমানের মালিন্য। তিনি কুমারীকে বলেন—"কী বললি? কখন আসছেন তোদের রাজামশাই?"

বাঁকা চোখে বাঁকা হাসি খেলিয়ে কুমারী বললো- -"সন্ধ্যা বেলায় রানীমা।"

রানীর খাস কামরার দোর বন্ধ করে কুমারী আর তারাবতী দু'জনে মিলে কী সব গোপন পরামর্শ করলো। করলো কী সব গোপন কাজকর্ম। দু'জনে মিলে পরামর্শ করে কি এক গুরুতর সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুলো তারা। রাজামশাই এলে কী কী বিশেষ ব্যাপার করা হবে তারও পরীক্ষা-মহড়া হলো দু'জনে মিলে। রানীর গুপ্ত বিদ্যার শিক্ষা আর কুমারীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এক সঙ্গে মিলে রচনা করলো এক অভিনব পরিকল্পনার মূল খসড়া। সেই বিশেষ পরিকল্পনা, যা বাস্তব রূপ নেবে সে দিন সন্ধ্যায় মহারাজা জয়ভদ্রের সামনে।

রাণী বাছাই করে বের করলেন একটা বাহারী পেয়ালা আর পিরিচ। আজকাল চা খাওয়ার জন্য যেমন পেয়ালা পিরিচের ব্যবহার ঠিক তেমনি দেখতে এই পাত্র দুটো। এরপর তিনি বের করলেন একই রকম দেখতে আটটা ছোট আকারের স্বর্ণ মুদ্রা—অনেকটা ঠিক আজকালকার দিনের প্রচলিত আধুলী মুদ্রার আকারের ও মাপের। এর চারটি মুদ্রা নিয়ে তার এক একটির ওপরে সামান্য একটু মৌচাকের মোমের ঢেলা বসিয়ে দিয়ে তারপর তিনি টেবিলের উপরে উপুড় করে শোয়ালেন পিরিচটা। পিরিচের উল্টো
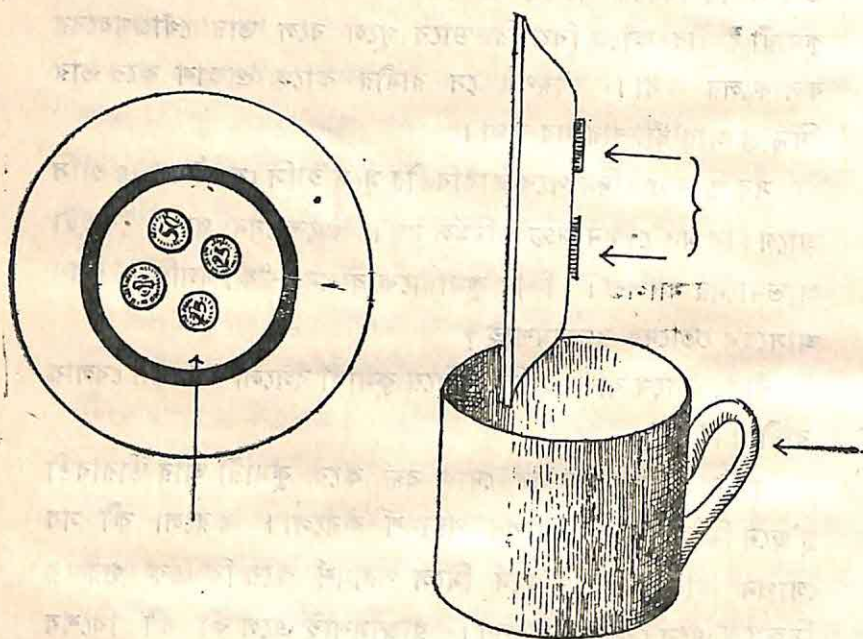
পিঠে যে খুড়ার মত উঁচু অংশ তার ভেতরে সাবধানে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলেন এই মোমের ঢেলা লাগানো মুদ্রা চারটে। মোমের লাগানো পিঠগুলো থাকলো পিরিচের দিকে। আস্তে আস্তে আঙ্গুল দিয়ে টিপে দিতেই মুদ্রা চারটে সেঁটে থাকলো পিরিচের

তলার খুরোর ভিতরের গায়ে। এরপর সঠিক ভাবে চিৎ করে টেবিলের উপরে রাখলেও মুদ্রা চারটে খুলে পড়লো না। এই পিরিচের পাশেই বসানো থাকলো পেয়ালাটা। সন্ধ্যাবেলা মহারাজ এসে যে আসনে বসবেন সেই আসনের কাছাকাছি একটা জায়গায় সাবধানে রাখা থাকলো এইভাবে কারসাজি করা পেয়ালা-পিরিচ। বাকি চারটে মুদ্রাও থাকলো রানী তারাবতীর হাতের কাছে দেরাজের মধ্যে। কুমারীর যা করার তাও তৈরী করে রাখা হয় আগে ভাগে।

কথা অনুযায়ী সন্ধ্যা লাগার সঙ্গে সঙ্গে আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর মুখে রাজা এসে ঢোকেন তারাবতীর মহলে। সামনে তারাবতীকে দেখেই তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "এই যে ছলনাময়ী কুহকিনী, নিজের চোখে সেদিন সন্ধ্যায় আমি প্রত্যক্ষ করেছি তোমার ব্যভিচার। জানো ও ব্যভিচারের সাজা কী? —মৃত্যু।"

"নিজের চোখে যা দেখেন, তাই কি সত্যি বলে বিশ্বাস করেন আপনি? চোখ কি ভুল দেখতে পারে না? দৃষ্টিবিভ্রম বলে কি কোনও কথা নেই?" মিনমিন করে বলেন রানী।

"কী বল তুমি? যা চোখের সামনে ঘটতে দেখবো তাই তো সত্যি। আমাকে ভুল পথে চালাতে এসো না, মিথ্যা বাক্যজাল বিস্তার করে দোষ ঢাকতে।" রেগে বলেন রাজা।

তা হলে একটু বসুন। দেখুন চোখের দেখাই সত্যিকারের দেখা কিনা। রাজা বসতে সামনে আগে থেকে সাজিয়ে রাখা টেবিলটা তাঁর সামনে টেনে আনেন তারাবতী। দেরাজ থেকে সেই চারটে মুদ্রা বের করে এনে রাজার হাতে দিয়ে রানী বলেন, "গুণে গুণে এই মুদ্রা কয়টা এই খালি পিরিচটার উপরে রাখুন।" রাজা তাঁর কথামত কাজ করেন। "কটা মুদ্রা এই খালি পিরিচে রাখলেন, মহারাজ? ঠিক করে বলুন।"

"চারটে।" উত্তর দেন রাজা। ঠিক গুণেছেন তো? কম বেশী নয় তো?"

রানীর কথা শুনে বিরক্ত চোখে রাজা তাকান রানীর দিকে। এর পর রানী খালি পেয়ালাটা তুলে দেখান রাজাকে। ভেতরে কিছু নেই। রাজা হাতিয়ে দেখেন। এবার রানী চারটে মুদ্রা রাখা পিরিচটা তুলে ধরে পেয়ালার ধারে পিরিচের কাণা ঠেকিয়ে রাজার চোখের সামনে সব কটা মুদ্রা ঢেলে দেন পেয়ালার মধ্যে। রাজার হাতে পেয়ালাটা দিতে দিতে তারাবতী জিজ্ঞাসা করেন— "মহারাজ, আপনার চোখের সামনে কটা মুদ্রা ঢালা হল পেয়ালায়?

"কেন? চারটে।" জবাব দিলেন রাজা।

"নিজের হাতে গুণে দেখুন।" বলে রানী কাপটা তুলে দিলেন রাজার হাতে আর পিরিচটা তুলে রাখলেন আলমারীতে।

রাজা মুদ্রা গুণে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এখানে যে আটটা মুদ্রা রয়েছে। রাজার বিমূঢ় ভাব দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে তারাবতী বললেন, "কি হল রাজামশাই, নিজের চোখে দেখলেন চারটে মুদ্রা ঢাললাম পেয়ালায়। এখন কি চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? চোখের দেখায় কি বিভ্রম হয় না কখনও?"

"তা না হয় হল, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় তোমার মহলে যা দেখেছি..."

রাজাকে শেষ করতে না দিয়েই তারাবতী বললেন, "জানি মহারাজ কী বলতে চান আপনি। আপনার সে সন্দেহেরও নিরশন করবো। একটু সময় দিন দয়া করে।" কথা শেষ করে তারাবতী দুবার তালি বাজালো। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ প্রহরীর বেশধারী এক গোফ-দাড়ি সমন্বিত নবীন যুবক এসে ঢুকলো কামরায়।

হতচকিত রাজার চোখের সামনে এগিয়ে গিয়ে রানী তারাবতী পরম আবেগে অতি ঘনিষ্ঠভাবে আলিঙ্গন করলো তাকে। সেই যুবা-প্রহরীও ঘনিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আকড়ে ধরলো রানীকে।

মূহূর্ত বিলম্ব না করে সচকিত রাজা চেপে ধরলেন 'উদ্ধত যুবকের'

ঘাড়। এক হ্যাচকা টানে তিনি বিচ্ছিন্ন করলেন এই প্রণয়ী প্রণয়িনীকে প্রেম আলিঙ্গন থেকে।

"একি নষ্টামী।" ক্রোধ-তপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

খিল খিল করে হেসে উঠলেন রানী তারাবতী। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তিনি টেনে তুললেন 'যুবা-পুরুষটি'-কে মেঝে থেকে। তাকে হিড় হিড় করে রাজার সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, "মহারাজ আবার দৃষ্টিভ্রম। চেয়ে দেখুন এ কে?"

তারপর রানী ধীরে ধীরে ঐ 'যুবা-পুরুষ'-টির মুখ থেকে তার নকল দাড়ি গোঁফ খুলে নিলেন। রাজা বিভ্রান্ত চোখে দেখলেন 'য়ুবা-পুরুষ' পাল্টে গেল রানীর প্রিয় পরিচারিকা কুমারীতে।

"মহারাজ, আপনার প্রাসাদের চিরপ্রচলিত একটি নিয়ম নেহাৎ অপারগ হয়েই সে দিন রাতে আমি ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে জন্য যদি কোন শাস্তি আমার প্রাপ্য হয় তবে তা আপনি আমাকে দিন। আমি মাথা পেতে তা গ্রহণ করবো। প্রাসাদের নিয়ম মত সন্ধ্যার পরে আমাদের কোন দাসীই প্রাসাদের বাইরে যেতে পারে না। সেদিন তো সকালের পর থেকে এক বারটিও আমার মহলে এলেন না আপনি। মন খারাপ করে বসে আছি। এমন সময় সন্ধ্যাবেলা খবর এলো কুমারীর বাবা মৃত্যু-শয্যায়। বাপকে শেষ দেখা দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো কুমারী। আবার লোক পাঠালাম আপনার কাছে। খবর এলো আপনি ভয়ানক ব্যস্ত।"

"সত্যিই খুব ব্যস্ত ছিলাম। অনেক জরুরী রাজকার্যের চাপ এসে সারাদিন মাথা তুলতে দেয় নি।" কৈফিয়তের সুরে বলেন রাজা।

"উপায়ান্তর না দেখে নিজের ঘাড়েই নিয়ম ভাঙ্গার দায়িত্ব নিয়ে কুমারীকে তার বাপকে শেষ দেখা দেখার সুযোগ করে দিলাম। পুরুষ পরিচারক বা রক্ষীদের বাইরে যাবার অবাধ স্বাধীনতা। দিনেই

হোক আর রাতেই হোক। তাই কুমারীকে সাজালাম এক যুবক প্রাসাদ-প্রহরী। আমার কাছে কিছুটা পরচুল ছিল। তাই দিয়ে বানালাম তার দাড়ি-গোঁফ। জানেনই তো আমার অন্য সব দাসীর চেয়ে কুমারী আমার অনেক বেশী কাছের, অনেক বেশী আপন। যাবার বেলায় ও বড্ড কান্নাকাটি করছিল তাই ওকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করছিলাম। আদর করছিলাম। 'প্রাসাদ-রক্ষী যুবকের' সঙ্গে আমার এই আলিঙ্গন ও আদরপর্বই আপনার প্রাণের শান্তি কেড়ে নিয়ে থাকবে, মহারাজ। আমাকে ক্ষমা করুন। এখন যে শাস্তি দেবার হয় আমাকে দিন প্রভু।" রাজার হাত ধরে কেঁদে বুক ভাসান রানী। কুমারী এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে অপরাধিনীর মত।

নিজের অবিবেচকতার জন্য লজ্জা পান রাজা। রানীর হাত ধরে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেন। বড্ড হঠকারিতা করে ফেলেছেন তিনি। স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে একবার সরাসরি রানীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল তাঁর। বারে বারে নিজেকে দোষী বলে গাল দিতে থাকেন রাজা।

হেসে রানী বলেন, "যেতে দিন মহারাজ, এ আপনাদের পুরুষ জাতের দোষ। স্বভাবতই আপনারা পুরুষরা একটু বেশি মাত্রায় সন্দেহবাতিক।"

প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন রাজা রানীর এই অনুযোগ শুনে। তার পর প্রাণখোলা দরাজ গলায় তিনি বললেন, "তোমাদের সবাইকে মাফ করলাম আমি। আমাকেও মাফ করেছ তো তুমি?"

মাথা নেড়ে নীরবে সায় দিলেন রানী।

পরের দিন নিজের এক দামী হার কুমারীকে উপহার দিলেন রানী। গলায় হার পরে রানীকে প্রণাম করে কুমারী একান্তে জিজ্ঞাসা করলো, "রানীমা, চারটে মুদ্রা পেয়ালায় পড়ে আটটা হল কেমন করে?"

"আরে সেটাও বুঝিস নি, মুখপুড়ি ? পিরিচের কানা পেয়ালার সামনের দিককার কানায় ঠেকিয়ে যখন পিরিচের সামনের পিঠ থেকে চারটে মুদ্রা পেয়ালায় ঢাললাম তখন আঙ্গুলের চাপ মেরে পিরিচের পেছনে মোমে আটকানো মুদ্রা চারটেও তো আলগা করে দিলাম। আপনা থেকেই তখন তারা পেয়ালার মধ্যে ঝরে পড়ে চারে চারে আট মুদ্রা হয়ে গেল।" কথার শেষে কৌতুকে হেসে উঠলেন রানী। হেসে উঠলো তাঁর দাসী কুমারীও।

এরপর রানীর প্রতি রাজার ভালবাসা, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

বর-পণ বিভ্রাট

গ্রামের নাম কামদেবপুর। সেই গ্রামে থাকতো এক জমিদার পরিবার। এক সময় এদের অনেক জমি-জমা পয়সাকড়ি ছিল। এখন পড়তি দশা। শরিকদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হয়ে এখন অবস্থা আর তেমন রমরমা নেই। তবুও মাঝামাঝি স্বচ্ছল অবস্থা তো বটেই। জমিদারবাবুর নাম রূপরাম রায়। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলের নাম অঞ্জন। মেয়ের নাম অরুণা। অঞ্জন শহরে থেকে লেখাপড়া করে। অরুণা পড়ে গ্রামেরই ইস্কুলে।

অরুণার বিয়ের বয়স হতে তার বাবা পাত্র খুঁজতে লাগলেন। বললেন বন্ধু-বান্ধবকে ; গাঁয়ে এক ঘটক মশাই ছিলেন। তাঁকেও বললেন রায় মশাই।

"লেখাপড়া জানা সুন্দর চাকুরে ছেলে চাই। ছেলেদের যেন নিজেরের বাড়িঘর থাকে। স্বজাতীয় ভাল পরিবারের ভাল স্বভাবের পাত্র চাই। বুঝলেন ঘটক মশাই ?"

"আপনার মনের মত পাত্রই এনে দেব, রায় মশাই। আমার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকুন।" বললেন ঘটক-মশাই।

ঘটকমশাই তাঁর কথা রাখলেন। দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি নিয়ে এলেন এক পাত্রের সন্ধান। কামদেবপুর থেকে মাইল চারেক দূরে আর এক গ্রাম। নাম রতিরামপুর। সেই গ্রামের চৌধুরীদের ছেলে নাম প্রবোধকুমার। ছেলে শহরের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। এম. এ. পাশ। গাঁয়ে বিষয় সম্পত্তি ঘর-বাড়ি আছে। এই বড় ভাই। বোন নেই। ছোট ভাই একজন। স্কুলের ছাত্র। ছোট পরিবার। পাত্রের বাবা হরেন্দ্র চৌধুরী গাঁয়ে থেকে বিষয়-সম্পত্তি দেখেন।

খবর নিয়ে জানা গেল, শহরের যে বিদ্যালয়ে অঞ্জন পড়াশোনা করেছে, পাত্র সেই বিদ্যালয়েরই শিক্ষক। অঞ্জন ছিল তাঁর অতি প্রিয় ছাত্র। অঞ্জনেরও খুব প্রিয় শিক্ষক ছিলেন এই প্রবোধ স্যার।

"তা হলে এখন কী করণীয়?" ঘটকমশাইকে জিজ্ঞাসা করেন রূপরাম রায়।

"পাত্রের বাবা এসে পাত্রী দেখে যাবেন। পাত্রী পছন্দ হলে আপনারা গিয়ে পাত্র দেখে আসবেন। সামনে লম্বা ছুটি আসছে। তার মধ্যেই বিয়ে সেরে ফেলতে চান পাত্রপক্ষ।" বলেন ঘটক-মশাই।

মেয়েকে দেখতে আসার দিন এসে পড়লো। বরের বাবা হরেন্দ্র চৌধুরী এসে হাজির হলেন রূপরাম রায়ের বাড়ি। সুন্দর করে সাজিয়ে অরুণাকে এনে হাজির করা হল হরেন চৌধুরীর সামনে। তিনি অরুণাকে দেখলেন। দু'চারটি সাধারণ প্রশ্ন করে তারপর ছেড়ে দিলেন অরুণাকে।

অরুণা চলে যাবার পর হরেন্দ্র চৌধুরী বললেন—"মেয়েকে তো দেখলাম..."

"মেয়ে পছন্দ হয়েছে আপনার?" জিজ্ঞাসা করলেন রূপরাম রায়।

"দেখুন মশাই, বিয়ের ব্যাপারে ছেলের মা-বাবার কাছে একমাত্র

মেয়েই বড় কথা নয়। মেয়ে সঙ্গে কী আনছে, মেয়ের বাবা জামাইকে কী দিচ্ছেন সেটাও একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ তো মশাই, শুধু আমাদের নিজেদের সম্মানের প্রশ্ন নয়, মেয়ে কী নিয়ে এলো সেটা তো চারজনও দেখবে। দেখে যদি লোকে নাক সিটকায় সেটা তো আমাদেরও ভাল লাগবে না। সেটাও ভেবে দেখুন।” হরেন্দ্র চৌধুরী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন শান্তভাবে।

“আপনার চাহিদাটা ঠিক কী ধরনের হবে। কতটা হবে। সে বিষয়ে যদি একটু আন্দাজ পেতাম তবে সুবিধা হত। ভেবে দেখতে পারতাম একটু।” বিনয়ের সঙ্গে বললেন রূপরাম রায়-মশাই।

“এতে আর বোঝাবুঝির কী আছে? আপনারা বনেদী পরিবার। আমার ছেলেও তো পাত্র হিসাবে ফেলনা নয়। এতগুলো পাশ দিয়েছে। দুর্লভ পাত্র, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? এ সব কথা বলতে ভাল লাগে না। তবুও কথা যখন উঠলো তখন তো না বললেও চলে না। আপনারা এই এক শ ভরি সোনা দিয়ে গয়না গড়িয়ে মেয়েকে সাজিয়ে দেবেন। পণ হিসাবে তেমন বেশি দাবি আমাদের নেই। ছেলের হাতে দশ হাজার টাকা নগদ দিলেই চলবে। এতে আপনাদেরই সম্মান বাড়বে। এ ছাড়া আসবাব, বাসনপত্র ইত্যাদি সে তো মেয়ের বাপ দিয়েই থাকেন। এর আগে অনেকগুলো পাত্রীপক্ষ এসেছিল। যা যা বললাম তার চেয়েও অনেক অনেক কিছু দেবার প্রস্তাব তারা দিয়েছিল। ওদের ঘর আমার পছন্দ হয় নি বলেই কাজ করি নি ওদের সঙ্গে। শুধু মেয়ে দেখলেই তো হবে না! মেয়ে কোন্ পরিবার থেকে আসছে তাও তো দেখতে হবে।” একটানা বলে গেলেন হরেন্দ্র চৌধুরী।

“আপনার ছেলে তো একবার মেয়ে দেখে যাবেন?” জিজ্ঞাসা করেন ঘটকমশাই।

“একি কথা বলছেন মশাই, আপনি? ছেলে আবার মেয়ে দেখবে

কি ? আমিই তো দেখে গেলাম। আমি বেঁচে থাকতে বিয়ের ব্যাপারে ছেলে নাক গলাবে, এ কেমন কথা ?" বিরক্তি ফুটে ওঠে হরেন চৌধুরীর কথায়।

"চৌধুরীমশাই, আপনি এখনো সেই মান্ধাতার যুগে পড়ে আছেন দেখছি। দিনকাল কত পাল্টে গেছে সে খেয়াল কি রাখেন না ? ছেলে আপনার এ যুগের যুবক। এতগুলো পাশ করেছে শহরে থেকে। হতে পারে সে আপনার বাধ্য ছেলে। তবুও তার চিন্তার স্বাধীনতা, ভাল-মন্দ ঠিক করার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া যুগ কত বদলে গেছে। আগেকার দিনের সাবেকী ধ্যান-ধারণার মূল ধরে বসে থাকলে কি আর যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবেন আপনি ? পাত্র এসে মেয়ে দেখে যাক। তার পছন্দ হলে দেনা-পাওনার ব্যাপারে কথা বলা যাবে আপনার সঙ্গে।" রূপরাম রায় বললেন।

"আপনার যখন তাই ইচ্ছা তবে তাই হবে। আপনিও একজন গণ্যমান্য লোক আপনার কথা তো আর ফেলতে পারি না।

দিন কয় বাদে প্রবোধকুমার তার দুজন বন্ধুকে নিয়ে অরুণাকে দেখতে এলো। তখন কলেজ আর বিদ্যালয়ের লম্বা ছুটি শুরু হয়ে গেছে। অঞ্জন বাড়ি ছিল। তাকে দেখে প্রবোধকুমার খুব খুশি হল। না পছন্দ হবার মতো মেয়ে অরুণা নয়। সে ফর্সা, সুগঠনা, সুন্দরী, সুকণ্ঠী, নম্র, বুদ্ধিমতী ও সুশীলা। প্রবোধকুমারের খুব পছন্দ হল অরুণাকে। তার বন্ধুরাও তার মতে সায় দিল।

পাত্র হিসাবে প্রবোধকুমারকে তো পছন্দ হয়েই ছিল সবার। এবার তার চেহারা দেখেও খুশি হল সবাই। রাজজোটক হবে বলতে থাকলো সবাই। খুব ভাল মানাবে দুটিতে। বলতে থাকলো সবাই।

কনের বাড়িতে খুব আদর আপ্যায়ন হল প্রবোধকুমার আর তার বন্ধুদের। ওরা সবাই খুশি। প্রবোধকুমার বাড়ি ফেরার

উদ্যোগ করছে এমন সময় অঞ্জন এসে ঢুকলো ঘরে। মনে হল সে যেন কিছু বলতে চায় প্রবোধকুমারকে।

"কী ব্যাপার, অঞ্জন? মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা বলতে চাও আমাকে?"

"হ্যাঁ স্যার, একটা খুব দরকারী কথা আছে। আমরা সবাই চাই অরুণার বিয়ে হোক আপনার সঙ্গে। কিন্তু একটা ব্যাপারে হতাশ হতে হচ্ছে আমাদের।" ধীরে ধীরে বলে অঞ্জন।

"কী ব্যাপার বল না। কোন সঙ্কোচ কোরো না। জানো তো কত স্নেহ আমি করি তোমাকে। কত প্রিয়পাত্র তুমি আমার। অসঙ্কোচে বল সব কথা।" ভরসা দেয় প্রবোধকুমার।

"কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনার বাবা দেনা-পাওনার ব্যাপারে......"

"আমি জানি, অঞ্জন। বাবা অনেক সোনা-দানা, দানসামগ্রী আর বর-পণের দশ হাজার টাকা দাবি করেছেন। তুমি জান আমি আদর্শবাদী লোক। কু-প্রথা আমার দু'চক্ষের বিষ। সোজা-সুজি বাবার অবাধ্য হয়ে তাঁর মনে আঘাত দিতে পারি নি তাই আমি এখনো কিছু বলিনি। বর-পণ, যৌতুক। এসব সমাজের কু-প্রথা। এই সব মান্ধাতার আমলের কু-প্রথা সমাজকে কোন্ রসাতলে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা একবার ভেবেও দেখছেন না আমার বাবার মত সমাজপতির দল। এর বিহিত করতেই হবে। আমার বিয়ের ব্যাপারে এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে।" কথা শেষ করে গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন হয় প্রবোধকুমার।

"স্যার, একটা কথা বলবো?"

"কী, বল।"

"আমাদের সঙ্গে পড়তো সেই যে সোমনাথ। তাকে মনে পড়ে আপনার?"

"ও সেই যাদুওয়ালার কথা বলছো। যে কথায় কথায় নানা মজা দেখিয়ে চমকে দিত আমাদের?" মুখ তুলে উত্তর দেয় প্রবোধকুমার।

"হাঁ স্যার, সেই সোমনাথ। ও বলতো যাদুর সাহায্য নিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান নাকি করা যায়। ওর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখলে কেমন হয় এ ব্যাপারে?"

"কথা বলে দেখ না একবার। ও যদি কোন পথ বাৎলাতে পারে। এদিকে আমি মা-র সঙ্গে কথা বলে বুঝে দেখি বাবার মন। ভেবো না একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।"

বাড়ি ফিরে এসে সে দিন সন্ধ্যায় প্রবোধকুমার একাকী বসেছিল তার ঘরে। এমন সময় তার মা এসে ঘরে ঢুকলেন, "হ্যারে খোকা, পাত্রী কেমন দেখলি?—তোর বাবা তো বলে, দেখতে যেন লক্ষ্মী প্রতিমাটি।"

"এইজন্যেই বুঝি বাবা চাইছেন যে সেই লক্ষ্মী প্রতিমা এক শ ভরির গাভর্তি গয়না আর নগদ দশ হাজার টাকা নিয়ে তোমার সংসারে পা দিক?" বিদ্রূপের সুরে মাকে বলে প্রবোধকুমার।

"আরে রাখ দেখি তোর বাবার কথা। বুড়োবয়সে ভিমরতি ধরেছে মিনসের। টাকা টাকা আর টাকা! সারাজীবন টাকা টাকা করেই গেল। বলে কিনা টাকা খরচা করেছি না ছেলেকে লেখা পড়া শেখাতে? সেটাকা তুলতে হবে না?"

"বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তাঁর কর্তব্য করে পুণ্যের ভাগী হয়েছেন। আমি যাতে ভবিষ্যতে সুখে থাকতে পারি। তাঁকে যাতে লোক গো-মুর্খের বাবা না বলতে পারে সে জন্যই তিনি তো টাকা খরচা করে আমাকে শিক্ষিত করেছেন। এর মধ্যে তিনি তাঁর ভাবি বেয়াই মশাইকে জড়াচ্ছেন কেন?"

"সে কথা কে বোঝাবে তোর বাবাকে? আমি বলি সুলক্ষ্মণে সুন্দরী সৎবংশের মেয়ে। যে ভাবে সম্প্রদান করে পাত্রী পক্ষ খুশি

হয় সেই ভাবেই করুক না তারা। গা ভরা গয়না পরাতে চাও তুমি গড়িয়ে দাও। তোমার সোনা তো তোমার নিজের ঘরেই থেকে যাবে। তা, কে শোনে আমার কথা। তোর বাবার লোভের শেষ নেই। বাপ-ঠাকুর্দার সম্পত্তি তো বাবু কম পাও নি। ছুটি তো মাত্র ছেলে। একটা মেয়েও নেই যে বিয়ে দিলে খরচ হবে। যা আছে তাই রেখেসেখে খাও না। লোকটার অতিলোভে ছাই দিতে পারলে আমার হাড় জুড়োতো।"

"আমারও তো সেই কথা। এখন যুগ পাল্টে গেছে। আজকের দিনে পণ-যৌতুক নেওয়া অপরাধ। কী করে বাবার এই কাণ্ড-কারখানায় সায় দিই বলতো মা ?"

"হ্যারে খোকা, সত্যি করে বল না। তোর বাবা মেয়ের রূপ-গুণের যা বর্ণনা দিয়েছে তা কি ঠিক? সত্যিই কি মেয়ে লক্ষ্মী প্রতিমার মত দেখতে ? তোর পছন্দ হয়েছে ?"

"তুমি দেখলে, আর দেখার মত চোখ থাকলে, তুমিও তাই বলতে। শুধু আমার নয় আমার বন্ধুদেরও খুব পছন্দ হয়েছে পাত্রী আর তাদের পরিবার-পরিবেশ।"

"তবে পাকা কথা বলতে বলি, কী বলিস ?"

"বাবার পণ-যৌতুকের ফয়সলাটা আগে করে নেওয়া যাক। কয়েক দিন অপেক্ষা করো। যখন বলার সময় হবে তখন আমি বলবো তোমাকে।"

এর পর দু'চার দিনের জন্য শহরে চলে যায় প্রবোধকুমার। শহরে অঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয় তার। অঞ্জন তাকে খুলে বলে অনেক কথা। তার কথা থেকে প্রবোধকুমার জানতে পারে যে অরুণার জন্য এক প্রস্থ গহনা অনেক আগে থেকেই বানানো আছে। তার ওজন প্রায় ভরি বিশেক। তা ছাড়া খাট, বিছানা, বাসন-কোসন সবই বানিয়ে গুছিয়ে রাখা আছে। নগদ টাকা বেশি নেই। হাজার ছয় হবে। এর মধ্যে হাজার চারেক যাবে খাওয়া

দাওয়া আর বিয়ের অন্য খরচায়। দশ হাজার বরপণ আর একশ ভরি সোনা আসবে কোথা থেকে?

সেই সঙ্গে অঞ্জন জানায় যে সোমনাথ তাকে পরের দিন দেখা করতে বলেছে। সে নাকি একটা পন্থা বের করবেই এ বিষয়ে।

"যদিও ভাল দেখাবে না। তবুও লজ্জার মাথা খেয়ে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।" প্রবোধকুমার গম্ভীরভাবে বলে।

পরের দিন প্রবোধকুমারকে সঙ্গে নিয়ে অঞ্জন গিয়ে হাজির হয় সোমনাথের বাড়ি। প্রবোধকুমারকে দেখেই মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠে সোমনাথ।

"আসুন স্যার, আসুন বসুন।" চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে সোমনাথ।

"বল্ আমার সমস্যার কী সমাধান করতে পারলি?" অঞ্জন জিজ্ঞাসা করে।

"তোর সমস্যার সমাধান 'ডাভ প্যান'।" রহস্যভরে বলে সোমনাথ।

"নে হেঁয়ালী রাখ। খুলে বল সব কথা।" অধৈর্যভাবে বলে অঞ্জন।

এবার সোমনাথ তার খাটের তলা থেকে টেনে বের করে একটা টিনের তৈরী বড় কৌটোর মত পাত্র। দেখতে অনেকটা টিফিন ক্যারিয়ারের মত কিন্তু কোন ভাগ নেই—একটানা! প্রায় টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনার মতই এর একটা ঢাকনাও আলগাভাবে বের করে আনে সে। তারপর সবার সামনে টেবিলের উপর সে রাখে এই পাত্র আর ঢাকনা। ঢাকনার ধারটা প্রায় ইঞ্চি দুয়েকের মত পুরু। এর ব্যাস সাড়ে ছয় ইঞ্চির মত। উপরের দিকটা চ্যাপ্টা গম্বুজের মত। তার উপরে লাগানো একটা ধরার হাতল। পাত্রটার মুখের ব্যাস এমন যাতে এই ঢাকনার দুই ইঞ্চি চওড়া ধারটা পুরোপুরি ঢুকে যেতে পারে তার ভেতরে। পাত্রটা লম্বায়

আট ইঞ্চির মত। পাত্রের তলার দিককার ব্যাস পাঁচ ইঞ্চি মতন।

অঞ্জনের হাতে দিতে অঞ্জন আর প্রবোধকুমার দুজনেই হাতিয়ে দেখে পাত্রটা। পাত্রটার পেটের কাছে দুটো ছোট ফুটো আছে। এরপর ঢাকনাটা হাতে নিয়ে সোমনাথ টেনে টেনে তার গা থেকে ছাড়িয়ে নেয় একটা পাত্র। এই পাত্রটা এতক্ষণ বেমালুম সেঁটে ছিল ঢাকনার যে দিকে হাতল লাগানো আছে তার উল্টোদিকে। তার মানে, ঐ যে দুই ইঞ্চি চওড়া ধারের অংশ, সেই অংশের উপরে একত্র হয়ে। এই পাত্রটা ঢাকনা থেকে আলগা করে খুলে নিয়ে সোমনাথ সেটাও দেয় অঞ্জনের হাতে। অঞ্জন নেড়ে চেড়ে দেখে। এই পাত্রটার গভীরতা ইঞ্চি দুয়েক মত। তলার দিকটা বন্ধ। মুখের দিকের ধারের কানাটা সিকি ইঞ্চি মতন করে চারদিক ঘুরিয়ে মুড়িয়ে বাঁকানো। সচরাচর বাটির কানা যেমন বাঁকানো থাকে তেমন ভাবে। পাত্রটার মুখের দিকের ব্যাসের চেয়ে তলার দিককার ব্যাস সিকি ইঞ্চি মতন কম। এর পর সোমনাথ অঞ্জনের হাতে দেয় হাতলওয়ালা সেই ঢাকনাটা। হাতে নিয়ে দেখতে গিয়ে একটু লক্ষ্য করতেই অঞ্জন বুঝতে পারে, এই ঢাকনা বানানো হয়েছে বেশ কৌশলে। প্রথমে একটা টিনের চাকতি নিয়ে সেটাকে পিটিয়ে তাতে চ্যাপ্টা গম্বুজের মতন করে বাঁকানো হয়েছে। যেমনটি টিনের বা পেতলের কারিগরেরা হামেশাই করে থাকে। তারপরে এই বাঁকানো চাকতির বাইরের চারদিকের অংশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমান করা হয়েছে পিটিয়ে পিটিয়ে। এর পরে এই চাকতিটাকে এমন ভাবে গোল করে কাটা হয়েছে যাতে তার ব্যাস পৌনে সাত ইঞ্চির মত হয়। এ সব করার পর একটা দুই ইঞ্চি চওড়া টিন নিয়ে সেটাকে গোল করে এমন একটি চাকা বানানো হয়েছে যার এক দিকের ব্যাস সাড়ে ছয় ইঞ্চির মত আর অন্য দিকের ব্যাস প্রায় সিকি ইঞ্চি মতন কম তার থেকে। এর পর চাকার চওড়া ব্যাসের দিকটা এমন কৌশলে ঝালাই করা

হয়েছে ঐ গোল করে কাটা চাকতিটার ভেতরের পিঠে যাতে এই গোল চাকার চারপাশে সব দিকে চাকতিটার সিকি ইঞ্চি অংশ বারান্দার মত বেরিয়ে আসে। এইভাবে চাকা লাগানোর পরে ঐ চাকতির হাতে একটা সিকি ইঞ্চি মত ফুটো করা হয়েছে আর হাতল লাগানো হয়েছে।

"নে অঞ্জন, এইবার ঢাকনা আর তার সঙ্গে যে দুই ইঞ্চি মতন গভীরতাওয়ালা পাত্র জোড়া ছিল সে দুটো এক সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখ।" হাসতে হাসতে সোমনাথ বলে।

টেবিলের উপরে সেই বাটির মত পাত্রটা রেখে অঞ্জন তার উপরে ঢাকনাটা ধীরে ধীরে বসাতে থাকে। ঢাকনা স্বচ্ছন্দে বসে যায় বাটিটার মধ্যে একেবারে খাপে খাপে। বাটির কানা আর ঢাকনার ছাতের সিকি ইঞ্চি মতন ঘোরানো বাড়তি অংশ একের উপরে অন্য বসে মিশ খেয়ে একাকার হয়ে যায়। দুয়ে যেন এঁটে-সেঁটে বসে যায়। যে কারিগর এই অদ্ভুত ঢাকনা আর বাটি বানিয়েছে তার গুণের প্রশংসা করতেই হয়। অঞ্জন ভাবে চুপ করে বসে বসে।

"এই অঞ্জন, ধ্যানে বসলি নাকি? নে তাড়াতাড়ি বাটিটা এবার খুলে নে ঢাকনা থেকে।" বলে সোমনাথ।

সোমনাথের কথায় সজাগ হয় অঞ্জন। অল্প একটু টানাটানি করতেই বাটিটা খুলে আসে ঢাকনা থেকে। এবার সোমনাথ ঐ বাটিটা নিয়ে বসায় সেই বড় পাত্রটার মুখে। বাটিটা ঠিক ভাবে বসতে পারে এমনিই ঐ বড় কৌটোর মুখ। এর পর কী মনে হতেই সোমনাথ বড় কৌটোর মুখ থেকে বাটিটা তুলে নেয়। চারদিকে বেরিয়ে থাকা বাটির কানা ধরেই সহজে সে তুলে নেয় এই বাটি। তার পর ঘরের কোণের খাঁচা থেকে সে বের করে আনে তার পোষা পায়রা। পোষা পায়রাটাকে কৌটো-পাত্রটার ভেতরে রেখে সোমনাথ পাত্রের মুখে বসিয়ে দেয় ঢাকনার সেই বাটিটা। গোটা

কতক টাকা-পয়সা আর নোট নিয়ে সে এবার পাত্রের মুখে বসানো ঐ বাটিটাতে ভরে দেয়। ভরার সময় সজাগ থাকে যাতে কোন
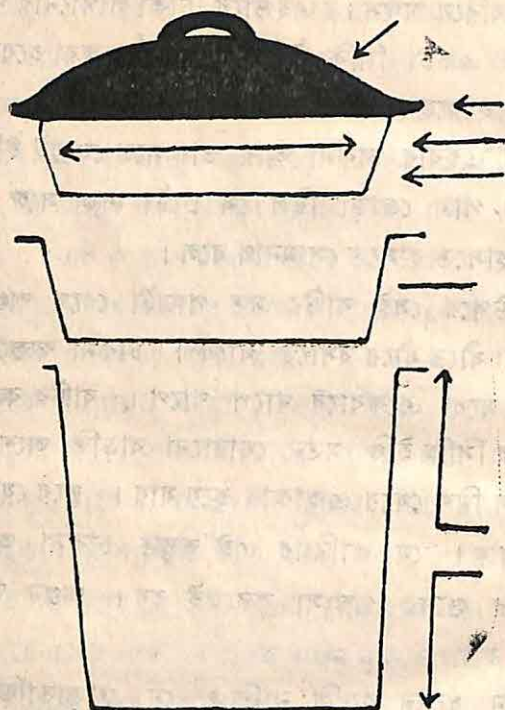
পয়সাকড়ি বাটির ধার ঘেষে না থাকে। এইভাবে দেখে মনে

হয় যেন ঐ গোটা আট ইঞ্চি মতন কৌটোটা পুরোপুরি ঠাসা আছে টাকা পয়সায়।

"স্যার, এবার দেখুন। আমার কাছে একশ টাকার নোট নেই। একশ টাকার নোট দিয়ে সাজাতে পারলে মনে হত এই কৌটো পুরোপুরি ভর্তি আছে একশ টাকার নোটে। তাই না? একটু লক্ষ্য করে দেখুন।" প্রবোধকুমারকে লক্ষ্য করে বলে সোমনাথ।

"হ্যাঁ, ঠেসে ভরে দিলে ঐ কৌটো ভরতে গেলে একশর বেশি একশ টাকার নোট লাগবে বই কি। দশ হাজার টাকার কমে একশ টাকার নোটেও পাত্র ভর্তি করা সম্ভব নয়।" মন্তব্য করে প্রবোধকুমার।

"এবার দেখুন দশ হাজার টাকার পরিণতি।" কথা শেষ করে এক ঝটকা টেনে পাত্র থেকে ঢাকনা তুলে নেয় সোমনাথ। থর থর করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গিয়ে কড়িকাঠে বাঁধা দোলনায় বসে পায়রা। পাত্র উপুড় করে সোমমাথ। কিচ্ছু নেই তাতে।

"দশ হাজার টাকা পায়রা হয়ে উড়ে গেছে, স্যার।" ঘাড় বেঁকিয়ে অভিবাদন করতে করতে যাত্নকরী কায়দায় বলে সোমনাথ।

হাততালি দিতে দিতে প্রবোধকুমার বলে "চমৎকার হয়েছে সোমনাথ। এ কৌশলেই কাজ হবে আমাদের। তুমি এই ধরনের হুটো 'ডাভ প্যান' ধার দিও আমাদের। বাকী যা করার তা বুঝে শুনে ব্যবস্থা করা যাবে।"

"অসুবিধা হবে না, স্যার। আমি হু'চার দিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলবো।" অন্ধবিশ্বাসে টগবগে গলায় বললো সোমনাথ।

সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়িতে বাড়ি রওয়ানা হল প্রবোধকুমার আর অঞ্জন। প্রবোধকুমার বাড়ি ফিরতেই তার মা এসে ধরলেন

তাকে, "কীরে খোকা কয় দিন তো পার হয়ে গেল। এবার তোর বাবাকে বলবো পাকা কথা বলে দিন ঠিক করতে?"

"পণ-যৌতুকের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছ তাকে?"

"বলেছি, কিন্তু তোর বাবা নাছোড়বান্দা। বলছেন—'একবার যখন চেয়ে ফেলেছি তখন আর না করি কোন্ মুখে? সম্মানের প্রশ্ন তো আছে একটা!' আমি অনেক করে বোঝাতে আর তোর মনের ভাবের কথা বলতে তিনি বললেন, 'আমি যা চেয়েছি তা থেকে নড়বো না। ছেলে যা বুঝবে তাই করবে।' পণ-যৌতুক নেওয়া যে আজকালকার দিনে নিন্দার ব্যাপার তা তাঁকে বলাতে তিনি বললেন, 'যা চেয়েছি তা ছেলের স্বার্থেই চেয়েছি। নিজের ভাল-মন্দ বোঝার বিদ্যা আর বয়স দুই-ই হয়েছে ছেলের। এখন সে যা বোঝে করুক। আমি বাপু, এক মুখে দু কথা বলতে পারবো না।' এখন তুই বুঝে শুনে যা করার কর বাপু। মেয়ের ছবি দেখেছি। আমার খুব পছন্দ।"

বিয়ের আগের দিন 'ডাভ প্যান' দুটো নিয়ে সোমনাথ এসে হাজির হল অঞ্জনদের বাড়ি। বিয়ের দিন অরুণা মোট গহনার অর্ধেকটা পরলো গায়ে। হাত-কান-গলা ভরে উঠলো গয়নায়। সোমনাথ কয়েকটা চুড়ি-দুল আর হার এমন ভাবে একটা ডাভ প্যানের উপরের বাটিতে সাজালো যাতে তার ধারের দিকে চারদিক ঘিরে সিকি ইঞ্চি মতন জায়গা ফাঁক থাকলো। বাটির মাঝখানে কোনও অংশে সামান্য কম ফাঁকও থাকতে দিল না। কৌটোটা খোলা অবস্থায় বাইরে থেকে দেখে মনে হতে থাকলো যেন সেটা গহনাতে পুরোপুরি ভর্তি। গয়না যেন উপচে পড়ছে তা থেকে। অপর প্যানটার উপরের বাটিটাও ঐ একই ভাবে সোমনাথ ভর্তি করলো নতুন একশ টাকার নোট দিয়ে। হাজার তিনেক টাকার নোটও লাগলো না। মনে হতে থাকলো যেন কৌটো উপচে পড়ছে দশ হাজার টাকার নোটে। খাট-বিছানা, বাসন-পত্রের সঙ্গে এই

পাত্র দুটোও ঢাকা খোলা অবস্থায় রাখা হল বিবাহ বাসরে। দেখে হরেন্দ্র চৌধুরীর চোখ লোভে চক্‌চক করতে থাকলো।

যথাবিধি বিবাহ পর্ব শেষ হল। শেষ হল ভোজ। ভোজের শেষে প্রবোধকুমার তার বাবা, আত্মীয়স্বজন আর অভ্যাগতদের ডেকে আনলো বিবাহ মণ্ডপে। তার পাশে এসে দাঁড়ালো সোমনাথ। ওরা দুজনে মিলে বসলো টাকা আর গহনার পাত্রের পাশে। সবাই যার যার মত বসে পড়লেন সামনের দিকে বিছানো ফরাসের উপরে।

ধীর গম্ভীর গলায় প্রবোধকুমার বললো, "বাবা প্রাচীনপন্থী মানুষ। তিনি তাঁর পুরনো ধ্যান-ধারণার প্রেরণায় নগদ দশ হাজার টাকা আর একশ ভরি সোনা দাবি করেছিলেন। আমার শ্বশুর মশাই বাবার সামনে তা হাজির করেছেন। আমি এযুগের শিক্ষিত ছেলে। আমি পণ-যৌতুকের বিরোধী। আজকের সমাজ চায় এই কু-প্রথা বন্ধ করে দিতে। পণ-যৌতুক প্রথা সমাজের পক্ষে মহা ক্ষতিকর। এ দুষ্ট গ্রহ। এ মহা অশুভ। এ যে সমাজের পক্ষে কী তা চোখের সামনেই দেখুন। দেখে নিজেরাই বিচার করে বলুন এই নগদ দশ হাজার আর এই একশ ভরি সোনা আমার গ্রহণ করা উচিত কিনা।"

প্রবোধকুমারের ইঙ্গিতে সোমনাথ সবার চোখের সামনে টাকা আর গহনার পাত্রে ঢাকনা চাপালো। তারপর পাত্র দুটো সবার মাঝে এগিয়ে এনে ঢাকনা খুলে ফেললো। দুই পাত্র থেকে দুটো দুটো চারটে পায়রা ডানা মেলে বেরিয়ে এলো। সবার সামনে পড়ে থাকলো একে বারে খালি দুটো পাত্র।

এই ঘটনায় হরেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যদের চোখ খুলে গেল। পণ-যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া দু'টোকেই তারা সে দিন থেকে গ্রাহ্য করতে থাকলো মহা অপরাধ বলে।

করলে চুরি পাবেই সাজা

অন্ধ্র প্রদেশে কৃষ্ণা নদীর তীরে এক গ্রাম। সেই গ্রামে থাকতো দুই চাষী। নাম গঙ্গারাম আর যমুনাদাস। যমুনাদাস ছিল অলস আর ধূর্ত প্রকৃতির। গঙ্গারাম ছিল সৎ, পরিশ্রমী আর নম্র স্বভাবের ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতো গঙ্গারাম। তার ক্ষেতে তাই ফলতো বেশি ফসল। আয় হত তার যমুনাদাসের চেয়ে বেশি। দিন দিন তাই ফিরছিল তার অবস্থা।

যমুনাদাস চাষ-বাসের কাজে তেমন মন দিত না। বেশির ভাগ সময়ই সে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আড্ডা-মজলিশে মেতে থাকতো।

যখন হাতে কিছু বাড়তি পয়সা জমলো তখন গঙ্গারাম চাষ-বাসের সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিল ডিমের ব্যবসা। বাজারে একটা ডিমের দোকান দিয়ে বসলো সে। এতেও তার বেশ দু পয়সা আসতে থাকলো।

যমুনাদাসকে তার বন্ধুরা পরামর্শ দিল গঙ্গারামের মতই ডিমের কারবার ফাঁদতে। তারা তাকে কিছু টাকা ধার দিয়ে সাহায্যও করতে চাইলো এ ব্যাপারে। সেই মত যমুনাদাস গেল গঙ্গারামের কাছে কারবারের মূল কথা জানতে। সহানুভুতি আর আন্তরিকতার সঙ্গে ডিমের ব্যবসার অনেক গোপন তথ্যই গঙ্গারাম অকপটে জানালো যমুনাদাসকে।

গঙ্গারামের দোকানের পাশেই দোকান দিয়ে বসলো নতুন ডিমের ব্যাপারী যমুনাদাস। পাশেই আর একটা দোকান বসলে নিজের দোকানের কাটতি কমবে জেনেও যমুনাদাসের প্রতি ভদ্রতা দেখিয়ে গঙ্গারাম কোন আপত্তি করলো না।

যমুনাদাস লোভী, নীচ ও অসাধু প্রকৃতির লোক। সুযোগ পেলেই সে গঙ্গারামের ঝুড়ি থেকে ডিম সরায়। একদিন গঙ্গারামের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে যমুনাদাসকে হাতেনাতে ধরে ফেলে

আচ্ছা মতন শাসিয়ে দেয়। দিন কতক গঙ্গারামের ডিম আর চুরি করে না যমুনাদাস। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। যমুনাদাস আবার শুরু করে তার 'মহাবিদ্যা'। ফাঁক পেলেই যমুনাদাস নেক নজর দেয় গঙ্গারামের ডিমের প্রতি। আর থাকতে না পেরে গঙ্গারাম নালিশ করলো পুলিশের কাছে। সেদিন তার কুড়িটা ডিম সরিয়েছিল যমুনাদাস। তদন্ত করতে দারোগা সাহেব এলেন। যমুনাদাস মুখ মুছে চুরির কথা অস্বীকার করলো। প্রমাণ কোথায়? পাশাপাশি দুই দোকানেই বিক্রী হয় একই রকমের হাঁসের ডিম। কোন্ ডিম কার দোকানের তার প্রমাণ হবে কেমন করে? বেজার মুখে ফিরে গেলেন দারোগা সাহেব। প্রণামী হিসাবে গঙ্গারামের দোকান থেকে নিয়ে গেলেন এক ডজন ডিম।

গঙ্গারাম পড়লো মহা ভাবনায়। এমনি ধারায় রোজ রোজ ডিম চুরি যদি অবাধ ভাবে নিয়মিত চলতে থাকে তবে তো তার ব্যবসা লাটে উঠবে খুব শিগগিরই। পরের ভাল করতে গিয়েই পড়েছে সে বিপাকে। লোকে বলে ভাল মানুষের গলায় দড়ি; তারও হয়েছে সেই দশা। ভাল মানুষের মত সে যমুনাদাসকে শিখিয়েছিল ডিমের ব্যবসার আটঘাট। বসতে দিয়েছিল তার পাশে দোকান খুলে। এখন উপকারীকেই বাঘে খাচ্ছে। তার উপকারের যোগ্য প্রতিফল দিচ্ছে যমুনাদাস। বাড়ি ফিরে দুপুর বেলা তন্ময় হয়ে এই সব ভাবছিল গঙ্গারাম। বেলা বয়ে যাচ্ছিল। স্নান-খাওয়া সারতে হবে সে দিকে হুঁস ছিল না।

তার স্নান করার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে অবশেষে তার বৌ এসে দাঁড়ালো তার সামনে। বললো—"এত আকাশ পাতাল কী ভাবছো গো?"

"ভাবছি এই ডিম চুরির কথা। ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছি না কিছু।"

"এ ভাবে ভাবলে আসল চোরের কী হবে! তার চেয়ে বরং

ভেবে দেখ ওকে হাতেনাতে ধরা যায় কী ভাবে। কী ভাবে তার চুরি প্রমাণ করা যায় পুলিশের কাছে। কী করে আচ্ছা রকম সাজা দেওয়া যায় তাই ভেবে দেখ।"

"অনেক ভেবেছি। কোন কুল-কিনারা পাইনি। আর ভাবতে পারছি না।" হতাশভাবে উত্তর দেয় গঙ্গারাম।

"আমার বুদ্ধি যদি নাও তবে একটা কথা বলতে পারি।" বলে গঙ্গারামের বউ, তাকে তেল-গামছা এগিয়ে দিতে দিতে।

"ভনিতা-ফনিতা রেখে বল না কী বলতে চাও।" মাথার চুলে তেল ঘষতে ঘষতে বলে গঙ্গারাম।

"গণপতি মামার কথা মনে পড়ে তোমার? সেই যে আমাদের বিয়ের সময় এসেছিল আমাদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। সেই যিনি মজার ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কথা বলছ তুমি?"

"সেই গণপতি মামার সঙ্গে দেখা করে দেখ না একবার। সে একটা উপায় বাৎলাতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। যা বুদ্ধি গণপতি মামার।"

বউয়ের কথা মতন পরের দিন গঙ্গারাম দেখা করে তার মামা শ্বশুর গণপতির সঙ্গে। তার সমস্যার কথা খোলাখুলি গঙ্গারাম জানায় গণপতিকে।

সব শুনে গণপতি বলে—"দাঁড়াও, এমন কায়দা বলে দিচ্ছি যাতে চোর বেটার বাঁচার কোন পথই খোলা থাকবে না। তুমি এক কাজ করো, যাবার পথে শহরের ভাল দোকান থেকে খানিকটা খাঁটি কড়া ভিনিগার নিয়ে যাও সিকি পাইন্ট পরিমাণ। আর ভাল দেখে ফিটকারী নিয়ে যাও এক আউন্স মত। একটা কাচের পাত্রে এই সিকি পাইন্ট কড়া ভিনিগারের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে ভালভাবে গুঁড়ো করে নেওয়া ঐ ফিটকারী বেশ ভালভাবে নাড়াচাড়া করে। ভিনিগার আর ফিটকারী মিশিয়ে যে তরল

বস্তুটা হল, সেটার সাহায্যেই তুমি ডিম চোরকে ধরে ফেলবে এবার।” কথা শেষ করে রহস্যের হাসি হাসে গণপতি।

“দোহাই মামা, আর হেঁয়ালী করবেন না। কী ভাবে এই বস্তুটা দিয়ে চোর ধরা যাবে দয়া করে তাড়াতাড়ি তাই বলুন।”

“বাড়িতে সরু তুলি আছে?”

“আমি চাষা-ভুষা মানুষ। তুলি দিয়ে কী কাজ আমার যে বাড়িতে তুলি থাকবে?” বিরক্ত হয়ে বলে গঙ্গারাম।

“না বলছিলাম, যদি না থাকে তো আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও একটা সরু তুলি। যে কয়টা ডিম নিয়ে দোকানে যাবে তার সবগুলো ভালভাবে ধুয়ে মুছে নিয়ে তার পর ঐ তরল বস্তুতে তুলি ডুবিয়ে সেই তুলি দিয়ে প্রত্যেকটা ডিমের গায়ে তোমার নাম সংক্ষেপে লিখে নেবে। দেখবে লেখার সময় তুলিতে যেন ঐ তরল লেগে থাকে। শুকোতে থাকলেই আবার তুলি ডুবিয়ে নেবে ঐ তরল বস্তুতে। ডিমের খোলার উপরে কিন্তু শুধু জলের দাগের মতন দাগ পড়বে। ভালভাবে নজর না করলে বোঝা যাবে না লেখার সময়েও। কাজেই লেখার সময় খুব যত্ন নিয়ে লিখবে। লেখা হয়ে গেলে ভাল ভাবে শুকতে দেবে ডিমগুলোকে। শুকিয়ে গেলে এর গায়ে কোন দাগ পর্যন্ত নজরে পড়বে না তোমার। বল তো এবার কী করবে?”

“মহা মুস্কিল, আমি জানবো কী করে। লক্ষ্মী মামা, রহস্য রাখুন। তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন সব কথা। আপনার ভাগ্নী আমার পথ চেয়ে ঘর-বার শুরু করেছে এতক্ষণ আমার জন্য।”

“তা এবার সব কথা শেষ করছি। ভাগ্নীকে বোলো আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। চোর ধরা পড়বেই পড়বে। শোন এর পর কী করবে। লেখা শুকিয়ে গেলে ডিমগুলোকে খুব ভালো ভাবে সিদ্ধ করে নেবে দশ পনের মিনিট ধরে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যে কোন একটা ডিম এর ভেতর থেকে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিলে

দেখবে ডিমের বাইরে খোসার ওপরে। এই ডিম চুরি করুক না বেটা ডিম চোর। চোরাই মালের খোসা ছাড়ালেই ধরা পড়ে যাবে সে।"

"রহস্য করছেন না তো, মামা। সত্যিই এমন হবে?" অবিশ্বাসের সুরে বলে গঙ্গারাম।

দৃঢ়কণ্ঠে গণপতি বলে, "তুমি কি আমার ঠাট্টারপাত্র বাবাজী, যে তোমাকে বাজে কথা বলে ঠকাবো? দেখে কিনো মালগুলো যেন খাঁটি হয় আর ভাল হয়। ভিনিগার যত টাটকা হবে কাজ তত ভাল। ভিনিগারে ফিটকারীতে মেশামেশির কাজটা যাতে খুব ভাল হয় সে দিকে একটু খেয়াল রাখবে ভালভাবে। তবেই কাজ হবে ঠিক ঠিক।"

শহর থেকে ভিনিগার আর ফিটকারী কিনে, সেগুলোকে লুকিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো গঙ্গারাম। এসে বউকে খুলে বললো সব কথা। সেই দিনই সে দুপুরে ভিনিগার আর ফিটকারি মিশিয়ে তরল বস্তু বানিয়ে নিয়ে তুলি দিয়ে গোটা ত্রিশেক ডিমের গায়ে নিজের নাম গঙ্গা লিখে ফেললো গঙ্গারাম। কালির বদলে সে ব্যবহার করলো ফিটকারী গোলা কড়া ভিনিগার। শুকিয়ে যাবার পর যথারীতি অদৃশ্য হয়ে গেল সেই লেখা, ডিমের গা থেকে এর পর পরের দিন ভোরে সেই নাম লেখা ডিমগুলো খুব ভাল করে জলে ফুটিয়ে দশ পনের মিনিট ধরে সেদ্ধ করে নিল গঙ্গারাম। এই ডিমগুলো একটা ঝুড়িতে ভরে সে নিয়ে রাখলো তার দোকানের সামনের দিকে। এমন জায়গায় রাখলো যেখান থেকে যমুনাদাস সহজেই চুরি করতে পারে।

দোকানে ডিমের ঝুড়ি নামিয়ে রেখেই গঙ্গারাম জল খেতে যাবার ছুতো করে বেরিয়ে গেল দোকান ছেড়ে। ইচ্ছে করেই যমুনাদাসকে বলে গেল। মওকা বুঝে যমুনাদাস গঙ্গারামের সেই 'বানানো ডিম'-এর ঝুড়ি থেকে গোটা দশেক আর অন্য ঝুড়ি থেকে

আরো গোটা দশেক ডিম সরিয়ে ফেললো। গঙ্গারাম দূরে একটা দোকানের আড়ালে ঘাপটি মেরে দেখতে পেলো যমুনাদাসের এই অপকীর্তি।

বেশি দেরি না করে তখনই গঙ্গারাম ডেকে আনলো বাজারের পাহারাদার পুলিশকে। পুলিশ এসে ধরলো যমুনাদাসকে।

"একি! আমাকে ধরছো কেন? কী করেছি আমি?" গোবেচারীর মত বললো যমুনাদাস। যেন সে কিছুই জানে না—এমনি ভাব।

"তুমি আমার দোকান থেকে ডিম চুরি করেছ।" বলে গঙ্গারাম।

"মিথ্যে চুরির বদ্‌নাম দিলেই হল। প্রমাণ কোথায়?" বড় গলায় বলে যমুনাদাস।

"আমার সেদ্ধ ডিম।" বলে গঙ্গারাম।

"আমিও বিক্রীর জন্য আজ কিছু সেদ্ধ ডিম এনেছি।" তার-স্বরে চেঁচায় যমুনাদাস।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে দারোগা সাহেব এসে হাজির হন সাইকেল চেপে। "ব্যাপার কী, আবার ডিম চুরির নালিশ না কি তোমার ওহে গঙ্গারাম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। আজকেও যমুনাদাস ডিম চুরি করেছে। আজ আমি হাতেনাতে প্রমাণ করতে পারবো, হুজুর। আমার ডিম সেদ্ধ করা।" অভিযোগ করে গঙ্গারাম।

"হুজুর, আমিও আজ কিছু সেদ্ধ ডিম এনেছি।" সাফাই গায় যমুনাদাস।

"তবেই তো হল, গঙ্গারাম। কেমন করে বুঝবে, যমুনাদাসের ঘরের সেদ্ধ ডিম তার নিজের আনা সেদ্ধ ডিম নয়? কই হে যমুনা-দাস, তোমার দোকানের একটা সেদ্ধ ডিম দাও তো আমার হাতে।"

দারোগা সাহেবের আদেশে যমুনাদাস তাঁর হাতে একটা সেদ্ধ ডিম দেয়।

"তোমার দোকানের একটা সেদ্ধ ডিম দেখি এবার, গঙ্গারাম।" গঙ্গারামও একটা সেদ্ধ ডিম তুলে দেয় দারোগা সাহেবের হাতে। ছু'হাতে দুই ডিম নিয়ে একবার এ হাতের দিকে আর একবার ও হাতের দিকে তাকিয়ে দারোগা সাহেব বলেন, "কোনও তফাৎ নেই দু ডিমে কী করে বুঝবে কোন্‌টা কার?"

"হুজুর, অপরাধ নেবেন না। একটা কথা শুনুন আমার। ডান হাত আর বাঁ হাত আপনার দু হাতের দুটো ডিমই এই গরীব গঙ্গারামের। খোশা ছাড়িয়ে দেখুন আমার নাম 'গঙ্গা' লেখা রয়েছে ডিমের ভিতরে।"

"কী ইয়ার্কির কথা বলছো তুমি! ফালতু কথা বললে তোমাকেই কিন্তু চালান করে দেব।"

"যা করার হয় করবেন, ধর্মাবতার। দয়া করে খোশা ছাড়ান তো একবার।" সোৎসাহে বলে গঙ্গারাম।

খোশা ছাড়িয়ে ডিমের ভেতর নজর ফেলতেই চক্ষু চড়ক গাছ হয় সবার। ভেতরে ডিমের গায়ে 'গঙ্গা' লেখা। পালানোর তাল করে যমুনাদাস। দারোগাবাবুর ইশারায় কনস্টেবল হাতকড়া পরায় যমুনাদাসের হাতে। যমুনাদাসের দোকান থেকে যত সেদ্ধ ডিম বেরয় তার সবারই খোসা ছাড়াতে তাতে 'গঙ্গা' লেখা দেখা যায়। যমুনাদাস নিজের দোষ স্বীকার করে। চুরির অপরাধে জেল হয় তার।

সাদরে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে এনে তার গণপতি মামাকে ভুড়ি ভোজে তৃপ্ত করে গঙ্গারাম আর তার বৌ। মাছ, মাংস, দই, মিষ্টান্ন সঙ্গে ডিমের ডালনাও পরিবেশন করা হয়। ঝোলের বাটি থেকে ডিম তুলতে তুলতে গণপতি মামা রহস্য ভরে বলেন তার ভাগ্নীজামাইকে। ডিম চোর ধরার প্ল্যানটা মাথা খাটিয়ে কেমন বের করেছিলাম বল দেখি!